অবিশ্বাস্য

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬১

চতুর্থ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬১

পঞ্চম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬১

ষষ্ঠ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

সপ্তম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,

৫, চিন্তামণি দাস লেন,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী:

গোপাল ঘোষ

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ:

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক

সুরসিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে—

এই লেখকের অন্যান্য বই—

দেশে বিদেশে (৯ম সংস্করণ)

পঞ্চতন্ত্র (১২শ সংস্করণ)

ময়ূরকণ্ঠী (১০ম সংস্করণ)

চাচা কাহিনী (৭ম সংস্করণ)

এক

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য, মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে, মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্নে দিত। কারণ এসব অসুবিধেগুলো যে রকম এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক্ দিয়ে আবার ঠিক সেগুলোই বর। মাছের সের দু' আনা, দুধের সের ছ' পয়সা, ঘিয়ের সের বারো আনা এবং সেই অনুপাতে আণ্ডা মুরগী সবই সস্তা। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাচ্চাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পূব-বাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না; ওয়েলশ মিশনারিদের কৃপায় মধুগঞ্জে একটি হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারী স্কুল যে পদ্ধতিতে চলতো তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল হস্টেলে সীটের জন্য পূব-বাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আড়াই-গজী ওয়েটিং লিস্ট্ আপিসের দেয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-খরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট রেণ্ট চার আনা!

মধুগঞ্জের আরেকটি সদ্‌গুণের উল্লেখ করতে লেখকমাত্রই ঈষৎ কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের হৃদয় আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা, কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারের

আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ, এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিম্বা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু' একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিম্বা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙ্গা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙ্গা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন ; সে কল্পনার পক্ষীরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য

পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন-প্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দু'টি মাত্র চোখই এক নিমেষে আমাকে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে'; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কি করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে। বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কি দেখেছে, কি ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে?

পূব বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব বাঙলায় 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘনসবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারী গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম জাম কাঁঠালের ঘনসবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের

আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ, এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিম্বা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু' একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিম্বা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙ্গা আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙ্গা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষীরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য

পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন-প্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়— আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার ছু'টি মাত্র চোখই এক নিমেষে আমাকে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে' ; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কি করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে। বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কি দেখেছে, কি ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে ?

পূব বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব বাঙলায় 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘনসবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারী গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম জাম কাঁঠালের ঘনসবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের

সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এও নয়, ওও নয়। মধুগঞ্জ পূব বাঙলার মত ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিম বাঙলার মত ঢেউখেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে এক তিসরা খেলা খেলার জন্য নয়া এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভাসখানা বিরাট্ আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পোঁচ—সামনের 'কাজলধারা' নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশ-ছোঁয়া বিরাট্ নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয়নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচিলের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রূপালী ঝরণা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রূপোর বিদ্‌রী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাত-ছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছো সেইখানেই থাকো।

এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গাঁয়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে এসিস্‌টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

দুই

প্রেমটা কিন্তু দু' তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ও-রেলি সত্যই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাঙ্গা তার উপর এদেশে বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যসবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্‌টিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলে তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয়, রাজপুত্তুর না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুরের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফর্সা তো আছেই কিন্তু তার চুল খাঁটি বাঙালীর মত মিশকালো আর তার

সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটে অসাধারণ ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও কালো, নিদেনপক্ষে বাদামী—আর চুল ব্লণ্ড্ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফর্সা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা ; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দু'দিকে পড়ে বিস্তর চা বাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে-সব বাগান থেকে ঝেঁটিয়ে আসত ক্লাবের দিক্ সায়েব-মেম আর তাদের আণ্ডা-বাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোর্ট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'আণ্ডাঘর' আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুরুব্বি রায় বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তীরও একটা 'অনবদ্য অবদান' আছে। ক্লাব তখন সবেমাত্র খুলেছে। সাহেব-মেমরা ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরে টুক্‌টাক্ করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায় বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায় বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বল্লেন, 'দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জন্য রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা ;

ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোঠে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালো-আদমীদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখেছ, সাহেবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশী—তার গায়ে আঁচড়টি লাগবার যো নেই।'

পাশা খেলোয়াড়রা এক বাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায় বাহাছুরেই সম্ভবে, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তানও তো বটেন!

সেই রায় বাহাছুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুপসে দিয়ে দেশে নাম করে ফেললে বিদেশী ও-রেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক্ লাগাচ্ছে আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায় বাহাছুর বললেন, 'ব্যাটা বদ্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত-পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কান দিলেন না। পুলিশের বড় সাহেব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেচ্ছা।

ক্লাব জয় করেছিল ও-রেলি প্রথম দিনই টেনিস খেলায়

জিতে নয়, হেরে গিয়ে। মাদামপুর চা-বাগিচার বড় সাহেব এ অঞ্চলের টেনিস চেম্পিয়ান। পয়লা সেট ও-রেলি জিতল; কারণ সে বিলেত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নূতন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম্ আর বড় সায়েব খেলেন সেই বেজলাইনে দাঁড়িয়ে আণ্ডিকালের কুটুস্-কাটুস্। অথচ পরের দু' সেটে ও-রেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবশ্যি গজচক্র কিম্বা অশ্বচক্র খেল না বটে। আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সাহেব প্রথম সেটে সূতো ছাড়ছিলেন; জউরীরা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ও-রেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউণ্ডার' হিসেবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, মাস্ট বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম্ ইত্যাদি। বড় সাহেবও খুশি। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কিনা, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স।'

পরদিনই দেখা গেল, ও-রেলি বুড়ো পাদ্রী সাহেব রেভরেণ্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনস্‌কে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা' ঘরের দিকে। বুড়ো পাদ্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে-সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিম্বা বাচ্চাদের সঙ্গে কাণামাছি খেলতেন। ও-রেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ' ঘটল। দেখা গেল, পাদ্রী এখন প্রায়ই

ক্লাবে এসে ও-রেলির সঙ্গে এক প্রস্ত বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধ্যের পর তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ও-রেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাদ্রী যে ও-রেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্য কারণও আছে।

ও-রেলির থানার কাছেই পাদ্রীদের ইস্কুল। চাকরিতে ঢোকার দিন দশেক পরে ও-রেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কি ?

ইনস্‌পেক্‌টর সোমকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'সোম ?'

'ইয়েস স্তর !

'নো ; আমাকে 'স্তর' 'স্তর' করো না।'

'নো, স্তর।'

'ফের 'স্তর' ?'

'ইয়েস স্ত—।'

বাচ্চাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সাহেব শুধাল, 'এরা কারা।'

সোম চুপ করে রইল।

ও-রেলি বলল, 'দেখো সোম, তুমি আমার সহকর্মী। তুমি যা জানো আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করবো কি করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কি করে ?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন।'

'ভালো করে খুলে বলো।'

'এরা দোঁআসলা ; এদের অধিকাংশ চা বাগান থেকে এসেছে। এদের বাপ—'

'থামলে কেন ?'

'—চা বাগানের সাহেব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী।'

ও-রেলি থ মেরে সব কিছু শুনলো। তারপর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধালো, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি কেন, এমন কি পাদ্রী সাহেব পর্যন্ত না ?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজের লজ্জার অন্ত নেই, তাই এরা তাদের ঘেন্না করে। পাদ্রী সাহেব ভালো মানুষ, তাই নিয়ে ওঁর দুঃখ হওয়ারই কথা। বোধ হয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চাননি।'

সেদিনই থানার থেকে ফেরার সময় ও-রেলি সোজা পাদ্রীর টিলায় গেল। পাদ্রীকে সে কি বলেছিল জানা নেই। তবে পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ও-রেলি—অবশ্য পাদ্রী সাহেবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুকে সগর্বে সানন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খবর শুনে এস ডি ও প্লামার ও-রেলিকে বললেন, 'গো স্লো।'

ও-রেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটা জানিয়ে দিতে কসুর করেনি।

রায় বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আখেরে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিত্তির !'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওর নাম দিয়ে ছড়া রানিয়েছিল,

'ও—রেলি, কোথায় গেলি ?'

সাহেব মানে শুধিয়ে উত্তর শুনে ড্যাম্ গ্লাড্।

তারপর হাত পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করলে,

'O, Mary, go and call the cattle
home,
Call the cattle home,
Across the sands of Dee,'

আমাকে ঐ ক্যাটলদের একটা মনে করেছ বুঝি ? তাই সই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা 'হোলি কাও'ই হলুম।'

তিন

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে। ও-রেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ক্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বুকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যানুযায়ী তাকে ড্রপ্ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের থলে সাড়ম্বরে নৌকা-বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকা বাচ নিয়ে যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন পূব বাঙলার নৌকা-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর মত। ও-রেলি উল্লাসে বে-এক্কেয়ার। নৌকা-বাচের আইন-কানুন সোমের

কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠলো মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে ওদিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশী না হয়। আমি এদিক সামলাবো—এখানেই তো জেতার গোল ?'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকা-বাচের 'ফাউল' আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটাফাটির ঠ্যালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরি রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্ পরোয়া কোরো না সোম। ফাউল বাঁচাতে গিয়ে খুন-জখম আমিই করবো। ইউ গো রাইট্ এহেড্।'

তারপর ও-রেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন 'গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড, ও হাউ গ্র্যাণ্ড' হুঙ্কার ছাড়লে, কমজোর নৌকাগুলোকে 'চীয়ার আপ্' করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা-ফাটাফাটি যে হ'ল না তার জন্য সোম আর বাইচ-ওলাদের অভিনন্দন জানালে।

সর্বশেষে সোম খুশিতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, 'আসছে বছর যে নৌকো জিতবে সে পাবে হুজুর ও-রেলির পিতার নামে দেওয়া 'মাইকেল শীল্ড'। পূব বাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বায় তিন হাত হবে,

হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পূব বাঙলার যে কোন ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় 'ছোড্ড' এ্যাড্ডা পোলাড্ডা।' হুজুর শীল্ড কি ধরনের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন ; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরি যাবে। তা যাক ! এখন আপনারা বলুন,

থ্রী চিয়ারস্ ফর ও-রেলি,
হিপ্ হিপ্ হুররে।'

সে কী হুঙ্কারে হিপ্, হিপ্। গাঁয়ের লোক এ ধরনের স্থূল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু' দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু' একটি পাঁড় ইংরেজ কালা আদমীদের রেস দেখতে আসেননি তাঁরা পর্যন্ত হুঙ্কার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, 'ও-রেলি ইজ গন্ কমপ্লীটলী নেটিভ !'

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি ও-রেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্‌চ্ করতো।

পাদ্রী বাঙলোর নয়মি, রুথ, ইভা, মেরি সব ক'টা সোমত্থ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরি দরে পড়ল ও-রেলির প্রেমে। সে হ্যাপা সামলাতে না পেরে ও-রেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ও-রেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে। সোম খবরটাকে বিয়ে বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী বাঙলোয় পোপের মৃত্যু-সংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে এবং চোখের জলের জোয়ার জাগালো নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায় এরা তো জানে না ও-রেলিকে আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিম্বা তাতেই বা কি, এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যেয় অশ্বিনী ভরণীকে টিঢ দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের নূন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী; এর সঙ্গে ফ্লার্ট করার জন্য পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাশমুখো ওল্ড মেড।

এ তত্ত্বটাও ও-রেলির জানা ছিল বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, 'দেখো, সোম, আর যে যা-খুশি ভাবুক। তুমি কিন্তু ভেবো না যে আমি পাদ্রী টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।'

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললো, 'ও কথা বলো না সাহেব। জাত মানতে হয়।'

ও-রেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ক্রিশ্চানের আবার জাত কি?'

সোম বললে, 'জাতের আবার ক্রিশ্চান কি?'

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ও-রেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

চার

খাসপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশি আড় নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। সোমকোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠালো মিষ্টি পাঠালো, মেমের জলে শখ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যি নিত্যি ডিঙ্গি চড়ালো, পাদ্রীর টিলা ঘন ঘন চড়ুই ভাতে নেমন্তন্ন করলো, ক্লাবে আর বাগিচা বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হল; এ দলের খুশির অন্ত নেই।

অন্য দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো কিন্তু কেমন যেন মিশুকে নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায় বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কাণা করে দিলেন আর একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল।

ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে ; আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তী ইয়ার্কী কি রে বাবা? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডামেঠাই খাওয়াবেন? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আণ্ডার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায় বাহাত্বরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না ; এবং এ ধরনের মুরুব্বিও তখন সর্বত্রই বিস্তর মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায় বাহাত্বর আবার বললেন, 'নেটিভ সায়েবে যেন তেলে জলে। সাবধান!' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধান-বাণীতে কান দেবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করল না।

রায় বাহাত্বর অবশ্য মেমসায়েবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসাহেব তাঁর গালকম্বল মান-মনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায় বাহাত্বর ভালো করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ-কামানো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন এবং অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে কিন্তু অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে তাঁর দাড়িগোঁফের কদর প্রকৃত রসিক রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সাহেবকে তিনি বহুবার বেকাবু করেছেন তার দুটি কারণ ;

প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল, বেগনি রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সায়েব চটেছেন, খুশী হয়েছেন, হকচকিয়ে গিয়েছেন কিম্বা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুডাবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসায়ের তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরা ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি যে তাঁর সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী সেকথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন, এবং বলতে বলতে উৎসাহের তোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদালত যে এদেশে শুভাগমন করেছেন—' বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট !'

মেম তো হেসেই লাল। রায় বাহাদুর ঘেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, 'ইটস্ ও' রাইট, রে ব্যাডুর ; থ্যাঙ্কয়্যু ভের মাচ্ ইনডীড্।'

রায় বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বুড়ো বয়সে সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম পুত্র সন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিফিনের পূর্বে 'বারের' পক্ষ থেকে বলেছিলেন, 'আদালতের পুত্র সন্তান হওয়াতে আমরা সকলেই বড়ই আনন্দিত হয়েছি।'

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেন নি। সেদিক দিয়ে তিনি

সত্যই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপরাসী ইন্তাজ আলীকে যে তিনি দু' আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সর্বশেষে খানিকক্ষণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

আড্ডা বললেন, "আপনিও তাজ্জব বাৎ বললেন, রায় বাহাদুর। বিয়ে করে কোন মানুষ বদলায় না, বলুন দিকিনি? অন্তত কিছু দিনের জন্য?'

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করলো সেও কোনো আপত্তি জানালো না।

রায় বাহাদুর বললেন, 'কি জানি, ভাই, আমার অতশত স্মরণ নেই। বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুদ্দার আমলে।'

জুনিয়র তালেবুর রহমান বললে, 'সে কি, স্যর! বিয়ের পূর্বের কেসগুলোও তো আপনার খুঁটিনাটি সুদ্ধ মনে আছে।'

উকিল মেম্বাররা সায় দিলেন।

রায় বাহাদুর গুণী লোক। মুনিঋষিরা যে রকম এককালে একসূরে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়ত খানিকটা আসল খবর ধরতে পেরেছিলেন তবে কি না ঋষিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেন্স্ অনাদর-অবহেলায় ক্ষয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটলো।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান তার উপর পার্টি পরবে ভোর অবধি বেদম নাচতে পারে—একটা ডান্সও মিস্ না করে। তাই

বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করবে কিম্বা হলের মধ্যিখানে বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাঁই পাঁই করে তার চতুর্দিকে সার্কেসি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্ততঃপক্ষে টাঙ্গো নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোদুল-দোলা জাগাবে সে আশা—এবং বুড়ী মেমেরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন ; কারণ, বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে ঢলাঢলি করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়াতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়।

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল কিন্তু আয়রল্যাণ্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে তবে ঝানুরা জানেন নববর (অর্থাৎ নওশাহ্—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কি রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চুপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্ষম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙ্গাতে গিয়েই বাদ-বাকি জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উল্টোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষীরা বললেন, বৃষ্টি হবে অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরলেন ; ফলং ?—ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পায়লোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা ঘরকে তার হকের পাকী সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকই তাই নিয়ে মাথা চুলকোল।

গ্যালা নাচের পর পাদ্রী-বাংলো দিলে পিক্‌নিক্‌। বাইরের বেশী লোককে নেমন্তন্ন করা হয়নি, কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাদ্রীরা এবাবদে বাঙালী, সাহেব কারোরই মত এত মারাত্মক নাকতোলা নয়। পাদ্রী টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বন-বাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেলস্টেশনে পৌঁছে। এ বনে বুনো আম, কাঁঠাল, বৈঁইচি, কালো জাম, পিপ্টি, মধুর সন্ধানে সকাল সন্ধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মৌসুমের সময় মাটিতে ফোটে অগুনতি লুট্‌কি ফুল, আর গাছের গা-ঝুলে ফুলে ওঠে রঙ-বেরঙের অর্কিড ('বাঁদরের ল্যাজ')। এ জায়গাটায় পিক্‌নিক্‌ করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছ-তলায় বসে ডুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না,—এখানে একা একা কিম্বা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুর অনুসন্ধানে বেরনো যায় আর লুকোচুরি খেলার অলিম্পিক যদি কোনো দিন তার সদর আপিস খুলতে চায় তবে গড়িমসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাদ্রী-টিলাতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিকনিকওয়ালারা আবার বরবধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক-ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ ঠারাঠারি করে।

বরবধূ বিয়ের পর প্রথম কয়েক দিন একে অন্যকে চিনে নেয় ঘরের ভিতরে, বাইরে, বারাণ্ডায়, নদীর পারে, চাঁদের আলোতে কিম্বা সমাজে—আর পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভৃতে বনের ভিতর একে অন্যকে চিনে নেওয়ার ভিতর আরেক অভিনব মাধুর্য আছে—ওদিকে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তারা নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে—ওরা তো এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদমৎ করার জন্যই।

খোয়াই-ডাঙার দিকদিগন্ত-মুগ্ধ কবি, পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল স্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবন-ধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, গ্রহসূর্যে, তারায় তারায় বিশ্ব-স্রোত বিশ্ব-গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন, সে কবি পর্যন্ত আপন বঁধূয়ার যে ছবিটিকে বুকের ভিতর এঁকে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্রপল্লবের অর্ধ-আচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে ;—

'পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার
কালো কেশে॥
হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠ-
বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।'

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে বটগাছ-

তলায়—পিকনিকের হেড্ আপিসে। অবশ্য বউ মেব্‌ল্‌ও তার গা ঘেঁষে।

বুড়ো পাদ্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন,—চল্লিশ বছরের আগেকার কথা। এসব গল্প মধুগঞ্জ বহুবার শুনেছে কিন্তু ও-রেলির কাছে নূতন।

'বুঝলে ডেভিড্, তখন আমি ছোকরা পাদ্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাবরেজিস্ট্রার। আমাকে অনেক করে বোঝালে টিলাতে বাংলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে দুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত, আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাষ্টের সময়।'

ও-রেলি শুধালে, 'টিলার মোহটা কি? আপনি তো হরিণ কিম্বা পাখি শিকারও করেন না।'

পাদ্রী বললেন, 'বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায় কিন্তু মশা মারা কঠিন। কি বলো, সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কত বার বলেছি, 'সোম্, রববার স্যাবাথ—শান্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে।'

সোম বললে, 'স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?'

তারপর ও-রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'আপনি-ই বলুন,

চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন লোক?'

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে সব কটা মেকি।'

সোম বললে, 'আমি পুলিশের লোক, স্যার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিস্‌মিস্‌ করবেন। মেকি খাঁটিতে তফাৎ আমি বেশি জানি। কিন্তু এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ও-দিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেন নি। বাজিয়ে দেখব কি করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব ক'জনাই মেকি।'

পাদ্রী বললেন, 'মাই বয়! কি বলছো?'

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে কক্‌খনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভিতর অনেক সৎ লোক আছেন—ও একটা আস্ত ভণ্ড।'

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, 'সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন জানো?'

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালে, 'কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?'

বুড়ী রেগে বললেন, 'বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন! ঝগড়ার তুমি কি জানো হে, ছোকরা? সেকথা থাক; সোম আসে শুধুমাত্র মুর্গী খেতে, বাড়িতে পায় না বলে।'

সোম বললে, 'মাম্মি, আপনি যে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা এতদিন বলেন নি কেন?'

বুড় থ' হয়ে বললেন, 'সে কি রে! তোকে এক শ বার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখি নি।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না।'

বুড়ো পাদ্রী ও-রেলি আর মেব্‌লের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড বললে, সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে তা সে কিছু ভুল বলেনি। আজ যে রকম ডেভিড মেব্‌ল্‌কে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসিকে। পনরো বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, 'তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ হল?' সেই সেদিনই আমি সামনে নিলুম। তারপর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনের' আরো পঁইত্রিশ বছর।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে চোদ্দ বছরের জেল। আমার বেলা তারও বেশী। বিয়ে করেছি চোদ্দ বছর বয়সে, তার পর কেটে গেছে প্রায় আঠাশ বৎসর। এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না।'

পাদ্রী সোমের পাতলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে। বাঘ-ভালুকের ভয় না করে। পাশের ঝোপে কোকিল কুহু কুহু করছিল।

আমাদের মনে কী আনন্দ, এমন সময় একটা হনুমান 'হুম' 'হুম' করে আমাদের সামনে দাঁত-মুখ খিঁচোতে লাগলো। গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখেনি, প্রায় ভিরমি গিয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজলো।'

বুড়ী মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস, ব্যস হয়েছে।'

এর পরও ডেভিড মেব্‌ল্‌ উঠলো না।

পাঁচ

দেখা যেত দু'জনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাঙলোর বারান্দায় ছাতা-ল্যাম্পের নিচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে। কখনো সায়েব মেম-সায়েবের হাত-পাখা-খানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেম-সায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দু'টো লাইমজুস নিয়ে আসছে। আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার এক প্রান্তে গ্রামোফোনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায়, কিম্বা টিলার বাগানের লিচুগাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে—সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতে দু'জনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচু-বাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেতো নদীপারে। নদী-পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, সেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিম্বা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল। কিসাই-কাজলের মোহানায় খেয়া-ঘাট; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া-নৌকোয়—বাতার উপর। তারপর দুপুর রাত অবধি খেয়া-নৌকোয় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরতো চাঁদ যখন ডুবুডুবু।

মেম আসার পর সায়েব টুরে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি নৌকোয় করে দু'দিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য ভলগা-মাঝির গান গ্রামোফনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো—মাঝিরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে;—তাদের গান সাহেবদের কলে বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে। তবে কিনা সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল্ ওদের দরদ্ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেষা ছোকরাটার বাঁশের বাঁশী চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুছে ভাটিয়ালির সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

এবারে নৌকোর বারোয়ারি ডাবাহুকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি!

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিষয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করলো। সায়েব-মেম এক অন্যের সঙ্গে অত কম

কথা কয় কেন ?—ভাগ্যিস ওরা জানতো না যে বিয়ের আগে ও-রেলি সাহেবের বাচাল বলে একটুখানি বদনাম ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দি বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতীই দেখালে ; গোরা হল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবাণী সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তখ্খুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামেলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।'

শুকুরুল্লা বললে, 'কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কখনো কাউরে চড় মারে নি। বক্কে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।'

মশলা-পেষা বললে, 'বউয়ের লগে যদি দুই-চারটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান্।'

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের মাঝি-মাল্লা চাষাভুষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না—অবশ্য পূর্ববাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা 'গোরা' এবং 'বিনয়ের' মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্যন্যায়ের তৈলাধার জ্বালিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্যের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির

ফলে যে রকম মনকষাকষি এবং মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়, চাষা-ভূষোদের ভিতর সে রকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হল, 'সায়েব-মেমেরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?'

পূব বাঙলার লোক জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার-কাটা হচ্ছে স্পোর্ট-বিশেষ—স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নাবে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

টুর থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, "হুজুর সরকারি কাজে কলকাতা গেছেন; জানেন তো আজকাল যা স্বদেশী-ফদেশী আরম্ভ হয়েছে।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'দু'দিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি 'স্বদেশীর' পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা। নেটিভদের সঙ্গে দোস্তী জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নেই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশম্যান; ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে চলেছে জোর 'স্বদেশী'। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরটা বেজে যাবে। চাই কি কম্পলসরি রেটায়ারমেণ্টও হতে পারে। থাক্, ওসব কথা কইতে নেই।'

জুনিয়র তালেবুর রহমান বললে, 'নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙ্গে—আর তারপর করছেন নোঙ্গরের খোঁজ। সোমের

সামনে খুলে দিয়ে দিয়েছেন শুঁটকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন, নাক বন্ধ করো।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'বাবা, সুধাংশু—'

সোম জিভ কেটে, দু'কানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম, রাম।'

এবারে ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল, তখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছাপ।

সায়েবরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটায়ই হোক তখ্‌খুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য—শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধূলো-পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নীরস বেরসিকও তখন কয়েকদিন ধরে আরব্য উপন্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও-রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তদ্দণ্ডেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধতে নেই। ও-রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, 'সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও-রকম শুকিয়ে গেছে কেন?'

মাদামপুরের বুড়া-সাহেব ঝানু লোক। ও-রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্‌টি প্লেস—ডিসেন্ট্রি আর ডিসেন্ট্রি। কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারিনে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, 'তা মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার নূতন খবর কি ?'

মাদামপুরের বড় সায়েব তখন আশা ছাড়েন নি ; বললেন, 'কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে আর মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে-নেউলে। একে অন্যের দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকাঠুকি। বললেন, 'মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার সব খবরই নূতন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে, সে-ও নূতন খবর, ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সেও নূতন খবর।'

বিষ্ণুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শান্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে তাঁকে চেপে দিয়ে বললেন, 'তাজা-বাসি আমরাই যাচাই করে নেব ও-রেলি। ওসব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না '।

আগে হলে ও-রেলি এতক্ষণ সুবোধ ছেলের মত টু বী সীন নট টু বী হার্ড হয়ে বসে থাকতো না। ততক্ষণ হয়ত সপ্রমাণ করে দিত গড়ের মাঠে সত্যই কতরকম নূতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপি, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোঁবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন্— কিম্বা হয়ত গম্ভীরস্বরে বয়ান করতো, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায়নি ; তবে কিনা এ খবরে কিছুটা সত্য, এখন ফার্পোর টেবিল-চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো হয়েছে, আর তারই উপর সায়েবরা থালা

পেতে হাপুর-হুপুর শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে. মালেগাটানি সুপ মাখিয়ে খাচ্ছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ করে বসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখে নি। গ্র্যাণ্ডে বসে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নি, ক্যালকাটা ক্লাবের বারে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুক চুক করেছে; কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারলো না, পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'ও-রেলি গোপন সরকারি কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে ফাঁকে করেছেন পার্টি-পরব। ছুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে বলে কি বলবেন, কি বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।'

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাশ্যে বললে, 'ঠিক তা নয়; তবে এখন কলকাতার মৌসুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীর ভাগই দার্জিলিঙ কিম্বা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হল।'

মীরপুর বললেন, 'সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেণ্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বদ্ধ কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!'

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো

নূতন পরিচয় জমাতে পারে নি। তবে কি সে জমাতে চায় নি? কেন, কি হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়—যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেরে গেলে সমাজে তার বড় দুরবস্থা—তাই আমতা আমতা করে বললে, 'না, না সেদিক দিয়ে আটকায় নি।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের সঙ্গে হুয়াইটেওয়েের দোকানে তার দেখা হয়েছিল। ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে,

'ক্রিকেটার হেণ্ডারসেনকে চেনেন?'

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'আমার দূরসম্পর্কের বোন-পো হয়।'

মীরপুর মেম কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল—মীরপুর বিষ্ণুছড়ার কথা কাটাকাটিকে সে 'স্বদেশী' বোমার চেয়েও বেশী ডড়াত—বললে, 'একটা ভালো ইংলিশ ক্রিকেট টিম নিয়ে আসছে-শীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা 'পিচ' সে তার আপন হাতের তেলোর চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হল 'পিচ'গুলোর ঘাস বকরির মত চিবিয়ে খেয়ে যাচাই করে নিয়েছে, কোনটা বোলারের স্বর্গ আর কোনটা ব্যাটসম্যানের—দরকার হলে 'কোয়ের ম্যাটিঙ'ও চিবুতে তৈরী। আমি বললুম, 'অতশত মাথা ঘামাচ্ছো কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা; তোমরা অনায়াসেই জিতে যাবে।

হেণ্ডারসন বললে, 'তার কিচ্ছু ঠিকঠিকানা নেই। বোম্বায়ের জ্যাম সাহেব—তোমরা নাকি নামটা অন্য ধরনে উচ্চারণ করো—তা তিনি 'জ্যাম' হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড়ু হাঁকড়ে সবাইকে ক'শ' বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবরও তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারে বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়ত জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল—'হার্ড নাট'।' আমি উত্তরে বললুম, 'অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার ন্যাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাইনে কিম্বা ন্যাজ সাফসুতরো রাখার জন্য বুরুশও কিনিনে।'

মাদামপুরের বুড়ো সাহেব লক্ষ্য করলেন, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি তার মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে। খুশী হয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'তা তুমি এখানে একটা ক্রিকেট টীম বানাও না কেন?'

ও-রেলি বললে, 'ভাবছি, শমশেরগঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাবো। সম্প্রতি লোকটা গুম খুনে জড়িয়ে পড়েছিল—অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাঁওতা মারলুম, সব প্রমাণ তৈরী, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্য তার বুকে যমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবানী করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।'

সবাই কলরব তুলে নূতন করে আবার সেই গুম-খুনের

পোস্টমর্টেমে লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট-আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পূব-বাঙলার গুম খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবা খেলার—রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। কত রকম কথা কাটাকাটিই না হল, বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যান্ত পোঁতা হয়েছিল, মীরপুরের মেম বললেন, গুলতান, লোকটার বড় ভাই-ই নেই, আর সে খুন হয়নি আদপেই ; পীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমশেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড়-বিড় করে বলতে শোনা গেল, ও-রেলিকে বোঝা ভার।

ছয়

অবিশ্বাস্য।

বরঞ্চ ইংরেজ সকাল বেলাকার বেকন আণ্ডা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কট্ করতে পারে, এমন কি, শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার শামিল—মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণ-এর তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেব্‌ল্‌ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায়নি!

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল, সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বখ্‌শিশ্‌ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেন নি।

এসব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। একমাত্র পাদ্রীদের কিছুটা হক্ক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বুড়ি মেম একবার ডেভিডের মফস্বলবাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে তেরাত্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমনকি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ি বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানলা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেব্‌ল্‌ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেব্‌ল্‌ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে ত্বু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকলো।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর

বেদনা কি হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোন্ দিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধালো মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল ?'

উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সোম গুড বাই বলে বারান্দা থেকে নেমে, লিচুতলা দিয়ে, গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ও-রেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল !'

স্মরণই করতে পারলো না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল কি না, যেটাকে সে কাৎ করতে পারেনি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাত বার হোঁচট খায় না—তার আবার ট্রাবল ! হাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায়, তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেব্‌ল্‌কে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ—মেব্‌ল্ বাহান্ন রব্বারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রুসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্লু, চাকরির জন্য পরীক্ষা, রাগবীতে একখানা পাঁজর

গুঁড়িয়ে যাওয়া এসব ও-রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয়নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেব্‌ল্ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেব্‌ল্‌কে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা—লেগেছিল বটে, কিন্তু আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও-রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায়, আর সমুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেব্‌ল্। 'উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভস্ মি', পরেরটায় বলছে 'হি লাভস্ মি নট্' এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে 'হি লাভস্ মি' না 'হি লাভস্ মি নট'-এ এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেব্‌ল্ সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, 'আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি 'হি লাভস্ মি'-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরোখানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে।'

সেসব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে, এনি ট্রাবল্!

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক্

কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায়নি। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধভাবে অন্ধকারে কোন্ এক ভবিষ্য অমঙ্গল আবছা-আবছা বুঝতে পেরে মানুষ যে-রকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ্ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ি পর্যন্ত আকাশের দিকে দু' একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে, ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম, বিয়ে-শাদী মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ভবিষ্যতকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্তেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তত্ত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে?

মধুগঞ্জে এসব বালাই নেই—মারোয়াড়ি নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলশ পাদ্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্ মেরীদের ষোল

পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধানে লেগে যান। তাঁর যুক্তি ; প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবিঠাকুর তাই সে-যুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষনে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের বনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কি করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায় বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকষহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক ডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পূব বাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জন বাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দু'টি কথা কইতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে

যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন-বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরা এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার উপর মেব্‌ল্ ও পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

সাত

মাদামপুরের বড় সাহেব বললেন, 'একথাটা আমি কি করে বিশ্বাস করি বলোতো, পার্সি। মেব্‌ল্ মিশুকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেণ্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কি করে অতখানি স্টুপ্ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসেবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এসব জিনিসে কান দেয় না পাকা খবর তারাই পায় বেশী

এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলবো, এসব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় জাগিয়ে খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—এ্যাণ্ড ভাইস-ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক যেসব মেয়েরা মেব্‌লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করতো তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সর্দার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন সেই কর্তব্য বোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুঙ্কার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্।'

খবর কিম্বা গুজোব যাই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্ ড্যাম্ সিরিয়স—মেব্‌ল্ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা হোঁৎকা

লোকটার প্রতি মেব্‌ল্‌ অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানেন না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতারা না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেন নি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী-জাত সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে?

কিন্তু এসব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সাহেব বিষ্ণুছড়াকে বললেন—'হাতা-হাতি হয়ে যেত'। তারপর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে? এক বৎসর যেতে না যেতে? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও? ও-রেলি কি তবে জানে না?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সি, তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলা-মেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম।'

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড্‌, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ!'

'তা ঠিক, তবে কিনা জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

'সেকথা ঠিক, কিন্তু পাদ্রী টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে-তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়। কিন্তু এখানে যে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ এস পি'র মেম! মাই গড! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এসব ঢলাঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণিজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙ্গোটার ইয়ার—উহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এঁরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায়, তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন,

তবে কি হত বলা যায় না ; এ স্থলে গুজবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জের 'আণ্ডাঘরে' গুজোব মাত্রেরই জন্মমৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড় ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ-ট্যাঁ করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তার পদ-মর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কার্লমার্কস্ যদি আণ্ডাঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়াজী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজীর' আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন!

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পূজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্‌লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেন নি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে

লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবি যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেব্‌লের গোপনতম অস্ত্রবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়লো না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ, দেখা গেল মেব্‌লের সৌন্দর্যে হিংসুটে খাটাশমুখোগুলো পাইকারি হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হত, কিন্তু অত্যন্ত অত্যাশিতভাবে তার ফিফ্‌থ্‌ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড় সাহেবের সাহায্যে।

এসব কেলেঙ্কারি-কোঁদল মেমেরা করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েব যে কখন এসে এক পাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি।

হঠাৎ এক সময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, 'শার্লট, তুমি যে কথা বলছো সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত ?'

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও করে, 'আপনারা আমাকে মাপ করবেন,' বলে আস্তে আস্তে বাইরে চ'লে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে। বরঞ্চ যদি বিষ্ণুছড়া তার খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্গীত গাইতে

আরম্ভ করতেন তবু আণ্ডাঘর এতখানি আশ্চর্য হত না, কারণ এ-অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণ-মালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিস্-ফিস্ করে এস ডি ও'র মেমকে বললেন, 'নিশ্চয়ই এক জালা হুইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে কক্‌টেল বানিয়ে।'

এস্ ডি ও'র মেমের সুরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখেছিলুম, হুইস্কির পিঁপে থেকে ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুর ছানা সেইটে চুক্-চুক্ করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'ঐ ড্যাম্ ক্যাট্‌টা গেল কোথায়? নিয়ে এসো এইখেনে—আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়বো।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প; টম্‌কে বলতে হবে। আপিসের কাউকে ডিস্‌মিস্ করতে হলে সে সেই সাত-সকাল ছ'টার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস যায়।'

এস্ ডি ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে বেচারী পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে 'পট-লাকে' নেমন্তন্ন করলে হয় না?' হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, 'ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারীর কি করে টাক হল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে

যে ঝুল্লে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া যাবে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সিরিয়সলি নিলে যে, মেমকে পর্যন্ত ধমকে দিলে—তবে কি?—কে জানে?

'গুড্ নাইট!'

'গুড্ নাইট!'

আট

বিষ্ণুছড়া আণ্ডাঘরে গুজোবটার উপর যে বম্-শেল ফাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কাটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্যই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হল—সায়েবের উপর চটে গিয়ে বিষ্ণুছড়ার মেমও হপ্তা তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেন নি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হল না। আর যত বড় রগরগে খবর কিম্বা পরনিন্দা, পরচর্চাই হ'ক মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হত না, কোন আবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, 'গ্রাসহপার মাইণ্ড্', প্রতি মুহূর্তে হেথায় লম্ফ, হোথায় ঝম্ফ। ইতিমধ্যে আবার লাকাউড়া বাগিচায়

একটা খুন হয়ে গেল। কুলি সর্দারের ডপকা বউ—'মিস্ লাকাউড়া'—ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল বলে সে তার গলাটি কেটে, গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক এক পয়সা করে 'পোল্' ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না।

'কি সরকারি কাজ ?'

সর্দার গামছা খুলে মুণ্ডুটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার করে চুঙ্গীঘরের দরজায় হুড়কো মেরে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই শিগ্গির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সত্যই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ।'

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব মেনে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে মুণ্ডুটা ফের গামছায় বেঁধে হেলে দুলে থানার দিকে রওয়ানা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সাহেবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন ?'

সর্দার বললে, 'করবো না ? বেটি আমাকে বললে, 'দেখ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ-ই-ঠো লড়কী নই। আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ-ই-ঠো মর্দ নস ; তুই বেছে নে তোর-টা,

আমি বেছে নি হমার-ঠো।' ঐসী বেতমজী? হারামজাদী আমার মুখের উপর এইরকম বেশরম বাৎ বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি, হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় সরকারী উকিলের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট্ অব ট্রুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড্। ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত।'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পৌঁছনর থেকে সর্দারের চোদ্দ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর ঐ লাকাউড়া বাগিচারই ছোট সাহেব করলে আত্মহত্যা। কেন ক'রল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেম সায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি ছিল সে নাকি আর কারো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বললে, সায়েব যে এদিকে এক কুলী-রমণীর কৃষ্ণালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে ক্ষেপে গিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধান্যেশ্বরী—তারপর দিবা রাত্তিরের সে মদের নেশায় ছ' ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার ক'রে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।

ততদিন ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হ'ল? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বিরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হ'য়ে দু'জনাকে এক ক'রে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ, বলা কিছু শক্ত, কারণ এটা ব্যক্ত'—দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায় ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু' নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধূমধড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশি। মেব্‌ল্ কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাঠাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা গোত্রের। সে চায়, পালা-পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সাহেব প্রটেস্‌টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কি করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি ব'সে মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে! ও-রেলি কিন্তু জোনস্‌কেই অনুরোধ ক'রলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্ম-পিতার অভাব মধুগঞ্জে হ'ত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি এম, যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী

হ'ত্তেন, 'পুয়োর ডেভিল—বেচারা—একলা-একলি মন-মরা হ'য়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশী হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই —অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাঁড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড্-ফাদার হবে প্রটেস্‌টানট্! মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্‌টানট্ হ'লে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়সূর্য। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সে-ই হবে ধর্ম-বাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মীন' অনেক 'বাট অফ কোর্স' ব'লে ইতি-উতি ক'রে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—ব'লে, ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিল-দরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্‌টানট্ই সই অথচ ধর্ম-বাপের বেলা সে কট্টর—ক্যাথলিক না হ'লে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। তখন 'বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'। ওদের ভাষায় বলতে হ'লে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ্, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ্ক অর সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালোই হ'ল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মত অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তা খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড্-ফাদার হ'তে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় ক'রে কি একটা ব'লতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তম্বী,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেব্‌ল্ দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস, আর জয়সূর্য তার রববারের গির্জের পোশাক প'রে বিহ্বলের মত এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর তদারক করলে। পাদ্রী টিলার মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের—পরবের উৎকৃট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না-পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙ্গের ঘাটে বাঁধা এক নৌকর ভিতর। দু' বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ ক'রে বুঁদ হ'য়ে ব'সে আছে।

সব খবরই আণ্ডা-ঘরে পৌঁছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'থাক! এবার

থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিয়ো না। কাট্ দেম একদম ডেড্। কি যে হ'ল, কি যে হ'চ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

দিশী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

নয়

মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার পর গোরের ভিতর কি কাণ্ড-কারখানা হয়।

কুরানে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-উল্-কিয়ামৎ—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন সবাইকে আল্লাতা'লার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন সকলের বিচার করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে আর পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কিয়ামৎ কবে হবে তার তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না, এই মুহূর্তেই হতে পারে আবার এক কোটি বৎসর পরেও হতে পারে—ততদিন অবধি গোরের ভিতর মরাদের কি গতি হয়?

কুরান নয়—অন্য শাস্ত্র বলেন,—গোর দিয়ে আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে আসার পর দুই ফিরিস্তা—দেবদূত—গোরের ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইমান (ধর্মমত) কি? সে যদি খাঁটি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ সাহেব তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিস্তারা উত্তর শুনে খুশী হয়ে বলেন, 'তোমার ইমান ঠিক, কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের কিছু দেরি আছে। ততক্ষণ অবধি এই নাও এক গাছা তসবী। আল্লার নাম স্মরণ করো।' তারপর শাস্ত্র বলেন

লোকটি খুশী হয়ে তসবী হাতে নিতেই তার সুতোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না। ফিরিস্তারা তখন তাকে ধুনুরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মত সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিস্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন। পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে।

অথচ পুণ্যাত্মা হয়ত মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে ; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেণ্ড আগে।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্যের ভিতর এক সেকেণ্ডে পরিণত করে দেবেন, আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেণ্ডকে লক্ষাধিক বৎসরে।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনা দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেণ্ডে বাজিয়ে দেওয়া হল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হ'ল এক ঘণ্টা ধরে।

তাই বোধ হয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই? জীবিত অবস্থায়ও তো

ঐ-ই। মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর 'ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে' মনে হয় 'লাখ লাখ যুগ' ধরে সে যেন কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

'মোতির মালা' গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন য়্যুগো পুরো একখানা কেতাব লিখে।

বাপ্তিস্ম পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেব্‌ল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে-বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকতো, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল। যেখানে আর দুটি প্রাণী— জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেব্‌লের কোলে মাথা গুঁজে দুটি ক্ষুদে হাত দিয়ে তার উরু জড়িয়ে ধরে, মেব্‌ল্ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো বা সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'ক্-ক্-ক্-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনস্—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধুনুরী কেউই আসে নি। 'সময়' কি বস্তু সে এখনো বোঝে নি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও-রেলিয়া স্থির করলে, মেব্‌ল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাঁশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির। বড় হয়ে সে বাপ-মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে উইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

টমাস কুক্, এমেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানীর ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেব্‌লে ও-রেলির বারান্দা ভর্তি হয়ে গেল। হিন্দীতে বলে,

'বাঘ কা ভাই বাঘেরা
কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা'

'বাঘ যদি দেয় পাঁচ লম্ফ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরোটা।' বাঙলায় প্রবাদ 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।' অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে, আমি লণ্ডন যাবো, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওলা চটি বইই পাঠায় তাই

নয়, সঙ্গে পাঠায় আরেক হুন্দর 'পথিক-দিক্-দর্শন'—তাতে আছে নরওয়ের ফিয়োর্ডে যেতে হলে কোন্ জামা-কাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উঁট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনকোলেশন নিতে হয় কি না। ফলে সেই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হনুমানের—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও-রেলি সেই অষ্টাদশ পর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পড়ে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সরকারী কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে শুধালে, 'স্যর, গুষ্ঠিসুদ্ধ নর্থপোল চললেন নাকি? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে তো মঙ্গল কিম্বা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায়।'

ও-রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মঙ্গল-শনির কথা বলতে পারিনে, কিন্তু নর্থপোল যেতে হলে এসবের দরকার হয় না। সেখানে যাবার জন্যে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই—আস্ত জাহাজ চার্টার করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্টো। কত সব অলটারনেটিভ দেখো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে, না কলম্ব থেকে, কিম্বা মাদ্রাজ থেকে? পি এণ্ড ও নেবে, না মার্কিন জাহাজ, না জর্মন? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড্ড নোংরা, কিন্তু রান্না ভারি চমৎকার। তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্ ব্লাইণ্ড ইন্ দি ব্যাম্বু-জাঙ্গল্? আমার হয়েছে তাই।'

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশী হ'ল।

বললে, 'তাহলে সায়েব, অন্ত ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—ইট্ দি বো স্ট্রিং টুডে—অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয়।'

ও-রেলি বললে, 'দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করো না। গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্ ওল্ড ইণ্ডিয়ান উইজডম্ বলে পাচার করেছ বিস্তর। এখন আর সেটি চলছে না। আমার পন্চা-টাণ্ট্রা, হিটোপ্‌ডেস্ পড়া হয়ে গিয়েছে। ধন্নুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমারই শেয়ালের কি হয়েছিল মনে আছে?'

সোম ইস্কুলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব মনে আছে, স্যার! ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা যাবে না? আপনারাই তো বলেন, 'ডিম না ভেঙে মমলেট বানানো যায় না।'

ও-রেলি বললে, 'ডিম দিয়ে মামলেড্ কি করে হয় হে? মামলেড্ তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে।'

'আজ্ঞে মামলেড্ নয়, মমলেট?'

'ও! অমলেট!'

'আজ্ঞে না। অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে। দিশী ডিমে হয় মমলেট। তা যখন মামলেড, মমলেটের কথাই উঠলো, ওসব তৈরি করেন মেয়েরা। জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না?'

ও-রেলির মুখ কঠিন হ'ল। সোমের দৃষ্টি এড়ালো না।

সুরসিক যদি বদমেজাজী আর খামখেয়ালী হয়, তবে তাকে

নিয়ে বড় বিপদ। যন্ত্র চট করে বেসুরো হয়ে যায় আর তার বিকৃত স্বর সব-কিছু বরবাদ করে দেয়।

ও-রেলির 'হুঃ' বীণাবাদ্যের মাঝখানে প্যাঁচার কণ্ঠের মত শোনাল।

সোম বুঝলে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঢোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়ত কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতালা। একটুখানি ইতিউতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ্ করতে যাচ্ছেন তো?

ও-রেলি বললে, 'না।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও বললে, 'বাটলার পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয় নি বলছিল।'

কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির স্বর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবতো, এই সাদা-মুখগুলোর মতিগতি বোঝা ভার, কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও-রেলিকে সে সত্যই ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল—'

এই সব পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমরা সফরে বেরই, আর সায়েবরা কি রকম মাত্র একটা সুট-কেস হাতে নিয়েই গটমট করে গাড়িতে ওঠে, তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঐ সুট-কেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরী করতে গিয়ে সাহেবদেরও হিমসিম খেতে হয়। মোকামে পৌঁছনর পর বাঙালী যদি দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে কারো কাছ থেকে ও জিনিসটে ধার নিয়ে পরতে পায়—এমন কি কুর্তাতেও খুব বেশী আটকায় না—কিন্তু সায়েবরা কোটপাতলুন ধার নিয়ে পরতে পারে না, ফিট হল কি না সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেব্‌ল্‌কে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা তৈরি করাতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। ভূমধ্যসাগর অবধি আবহাওয়া গরম, মধুগঞ্জের জামা-কাপড়েই চলবে। কিন্তু তারপরের জন্য যে গরম জিনিসের প্রয়োজন, সে তো মধুগঞ্জে পাওয়া যায় না। তাই ফ্লানেল, সার্জ, টুইড আনাতে হ'ল শিলঙ থেকে, আর আনাতে হ'ল শহরের বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে পড়ে রইল মেব্‌ল্ দিনের পর দিন, আর ও-রেলি বাক্স-সুটকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে লাগল জাহাজের লেবেল। যে বাক্স যাবে কেবিনে তার এক রঙ, যেটা যাবে স্টোররুমে তার অন্য রঙ এবং যেটা হাতে থাকবে তার জন্য কোনো লেবেলের প্রয়োজন নেই। এই রামধনুর রঙের প্যাঁচে ও-রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চার পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর কি!

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র সব ফিটফাট ছিমছাম হ'ল। পরদিন ভোর ছ'টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে

কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, কারণ পরদিন ভোরবেলা এসে মালপত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কাম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার—অন্য চাকরবাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হ'ল। চাকর-বাকররা কোনো-গতিকে ছ'টায় বাঙলো পৌঁছে দেখে সবাই চলে গিয়েছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও-রেলি সায়েবের সব-কুছ তড়িঘড়ি, ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকররা আন্দাজ করলে সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার জন্য তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দু'খানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়র তালেবুর রহমান বলেছেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'সে কি কথা! ও-রেলির মত

ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কি বলো সোম?'

সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?'

রায় বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী।'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হ'ল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারীটা তো চাপা পড়লো। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে ফিরে এলেই হয়।'

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

দশ

বাড়ির সামনের জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে তুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু যেদিন খবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাব তার সম্বন্ধে আরেক প্রস্ত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি এম-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, 'ভালোই হ'ল। যাচ্ছে কক্সবাজার না

কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারীটা হয়ত পৌঁছয় নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুওর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কি হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাতটা ছোটায়? আই লাইক দ্যাট— আপনিও যেমন!' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'আমি সেকথা ভাবছিনে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেব্‌ল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পোঁছয় নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেব্‌লের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন পৌঁছে কেবল্। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, সুয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স হয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কার্ফ, সুয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়ত বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, 'কলকাতার ও শী'র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্‌ল্ আর তার বাচ্চাকে সে

মাস তিনেক আগে দেখেছে মস্থুরিতে, সঙ্গে ছিল ও-রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানিনে, ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মস্থুরি গিয়েছিল।'

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে? ও শী? কটা মেব্‌ল্‌ আর ক'টা ডেভিড্‌ দেখেছিল জিজ্ঞেস করো নি? ও তো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্‌ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে। ক'টা মস্থুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্‌ল্‌রা লণ্ডনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে? আশ্চর্য! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারী টপ্‌ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম 'ফাইন ওয়েদার, সোম।' মুখখানা করলে যেন আলীপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্‌ট্রিমলি কনফিডিয়েনশেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি, সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে,

কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামা-চাপা ডার্টি লিনেন বেড়িয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপিয়ন কমুনিটির কি লাভ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জানো তো প্রবাদ, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।'

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না? ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে এমন কি টেনিসের একস্ট্রাও। চেরিটি-ফেরিটির পয়সায়ও কামাই দেয় নি।'

মাদামপুর বললেন, 'সাউণ্ড করে দেখতে পারো। কিন্তু আসবে কি?'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজী হ'ল তবে ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলী টী-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হ'ল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সামারসেট ডীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগরেট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে খাস তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে, ফিসফাস-গুজগাজ করাতে ইংরেজ এবং

বাঙালীতে কোন তফাৎ নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এসব করা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেব্‌ল্‌ সম্বন্ধে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনপ্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মুরুব্বিদের পক্ষে ভাল দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি এম শ্রেণীর দু'একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনোপ্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্ধ আশা প্রকাশ করলেন, মেব্‌ল্‌রা বিলেতে ভাল আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিম্বা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও-রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলা দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে—কথাবার্তা হ'ল সেই সম্বন্ধেই বেশি। ও-রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এসব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিসের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামেণ্ট যদি সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বই কমবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয়, পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে—সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও-রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সুখের হ'ল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছোঁড়ার মাথাটা

ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত স্ক্রু করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সুখী হয়।'

বিষ্ণুছড়াও সায় দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট্। ইট্ ইজ নেভার টু লেট্ টু বিগিন্ এগেন্।'

মীরপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও-রেলিকে একবার এক লহমার তরে একলা পেয়ে তার ডান হাতে চেপে বলেছিলেন, "ও-রেলি, তুমি আমার ছেলের বয়সী, তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে হুবহু জিগশো ধাঁধার মত—প্রথমবারেই সব কটা মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মত কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও-রেলি স্পষ্টই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাঙলোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাঙলোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন্—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকর-বকর করতে ভালোবাসে—এককালে ও-রেলিও গালগল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না—কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও-রেলিরও ব্যবস্থাটা মনঃপূত হ'ল, তাই যদি বা ডীন দু'একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করালে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উল্টে দু'একটা

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও-রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হ'ল দেখে ডীন শুধালে, 'এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি কোনো টিপ্‌স্ দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।'

ও-রেলি বললে, 'সেকথা যে আমি ভাবি নি তা নয় এবং দেবার মত টিপ্‌স্ থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম—'

ডীন বললে, 'সরি আমি বড্‌ড বেশি কথা বলি,—না?'

ও-রেলি বললে, 'নটেটোল। চুপ করে অন্যের কথা শুনলেই যে অপর পক্ষকে বেশি চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নিজে কথা বলে বলে অন্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়—তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন্ প্রসঙ্গে সে ইন্‌ট্রেস্ট নিচ্ছে, কোন্‌টাতে নিচ্ছে না—তাই দিয়ে মানুষ চেনা যায় অনেক বেশি। তার উপর সমস্তক্ষণ কথা বললে অন্য পক্ষ কোনো প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না—যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল বোর্ড চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ৯০ সালের ভূমিকম্প, আর গিরের ফিতে না ইঞ্চির ফিতে ভালো, এসব নিয়ে এমন গল্প জোতেন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই তখন মুশ্‌কিল হয়ে ওঠে।

'সে কথা যাক্। আমি মাত্র একটা টিপ্ দেব। আঁপনার আপিসের সোম—তার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে—বড় খাঁটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক নূতন পদ্ধতি শিখে এসেছেন, সেগুলোর ক'টা এখানে কাজে খাটবে জানিনে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মত বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারি নি।'

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'দেখে তো কিন্তু বুদ্ধু বলে মনে হয়।'

ও-রেলি হেসে বললে, 'প্রিসাইসলি! ঐ তার একটা মস্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্ দ্যাট্ স্টিনক্‌স ইজ নট্ রট্‌ন্ ফিশ্—ঝল-ঝল করলেই সোনা নয় হচ্ছে তার উল্টো প্রবাদ। বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মত; কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশি। সোম ঐ বর্মী-ফল।'

'তাহলে গুড্-নাইট।'

'গুড্-নাইট।'

এগারো

'খ্রীষ্টালয় থেকে সন্থাগত'—'ফ্রেশ্ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বয়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উন্নাসিকই হোক না কেন, পুলিশ সাহেবের বাঙলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দু'জনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দাটাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগরেটের তাজা টিন খুলে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লণ্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারেন নি—অথচ গুণীরাই জানেন যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশি।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নিচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ

অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে খাসা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগরেটখেকোরা আর সিগরেটের নেশা করে না—রিঙের নেশায় পিল-পিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, এ-কথা সবাই জানে, আর তামাকখোররা যায় আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই উঠছি', 'আরেকটা খেয়েই উঠবো' করে করে ঘুমে আর সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট মশারি পোড়ায়।

ডীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ডান হাত চেয়ারের হাত থেকে খসে ঝুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসি-খসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ডীন দেখে তিনটি প্রাণী—মূর্তি—কি বলি? —বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে—সিঁড়ি তার-ই গা-ঘেঁষে।

ডীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সব-কিছু যেন আবছা-আবছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে ফকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে

মাঝারি; দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয়টি বেশ লম্বা—ব্যস আর কিছু না।

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, নিচের তলার ছাতা-ল্যাম্প বেয়ারা অনেকক্ষণ হ'ল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলায় আলো সেখানে পৌঁছয় না। ডীন সন্থ বিলেত থেকে এসেছে—মফঃস্বলে টর্চের কি প্রয়োজন এখনো জানতে পারে নি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিক জন-মানব-শূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চীৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছে বিন্ চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখে নি—সে শুদ্ধ কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই; রজ্জু দেখে যখন সর্প-ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যক্ষ করল? তাই বা কি করে হয়? বেড-রুমে তো কারো থাকার কথা নয়—ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের

তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ? ডীন চেক্-আপ্ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল বল্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান ? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট ছু' পেগ—তাও ডিনারের আগে। ছু' পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট না করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিশের লোক—প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ডীন পিস্তলটা স্যুটকেশ থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকাল বেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোর ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বার্নিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হ'ল ডীনের। সে দিনই আণ্ডাঘরের বেয়ারা মহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়াসী।

কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিম্বা ঘুমের জড়তায় কি দেখতে কি দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করলে—ইস্তেক পিস্তল বের করলে! কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর স্যুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মস্করা করেছে, আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেরে শুধু হুম হুম করেছে। তার তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ওচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হ'ল কি?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা, নিজকে এতক্ষণে সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত ক'টায় কাণ্ডটা ঘটেছে? কি জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, দুপুর কিম্বা শেষ রাতে।

সোম চলে গেল।

'টু হেল'—অর্থাৎ চুলোয় যাকগে বলে ডীন. মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়র খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু চুলোয় যাকগে বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মত জ্বালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের বেলার হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হ'ল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিডি-জিটেশনও নয় কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড়?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়ি গুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কি যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে ওঠা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে সূক্ষ্ম—অতি-সূক্ষ্ম—ছিদ্র করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে বাংলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কানা করে দেয়—চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজকে সাহস দেবার জন্য শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ—শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানাতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদেয় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু' পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায় এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু আজতো সর্বচৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মত তীক্ষ্ণ সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আদৌ মদ খায় নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক সেটা খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা—অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয় নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। মাই গড বলে চাপরাশীর

টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না।

অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিদ্রা-জাগরণে মেশা আস্থুপ্তির ভিতর দিয়ে রাত কাটলো।

সকাল বেলা সোম এল। তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালে, 'সোম, এ বাড়ি ভূতুড়ে?'

সোম বললে, 'জানিনে স্যার।'

'তুমি ভূত মানো?'

'নো, স্যর।'

'তাহলে এ বাড়ি কিম্বা যে কোনো বাড়ি ভূতুড়ে হয় কি করে?'

'জানিনে স্যর।'

ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস্ একটা আস্ত গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মত ঠাওরালে কেন?' ঠিকই তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে একথা বলে সে শুধু গাধা চেনে না তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরো পাকাপাকিভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হ'ল।

সপ্তাহের শেষে আই জি-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কি করে

যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে—কিন্তু তাহলে আবার নূতন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারেই পুলিশ বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাগকে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট।'

ডীন খাপ্পা হয়ে বললে, 'ড্যাম দি স্পিরিট।'

বারো

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ সগর্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে হেরে জর্মন তার সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জর্মন লিখত এবং জর্মনেরটা ইংরেজ তাহলেও হয়ত খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিম্বা যদি ভারতবাসী লিখত—কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরপেক্ষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশেপাশের, বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন চা বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুন্ধুমার। তার ইতিহাস লেখা হয় নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দবাদ কোন্ এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বুড়ো হয়ে কিম্বা অসুখ-বিসুখ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যেয় সবাই এক জায়গায় ম্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে, আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূর দিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তার পিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন, লড়াইয়ে যাবার জন্য বিলেত থেকে কোন্ দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম-তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না—এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে। সিভিল সার্জেন ইংরেজ তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এঁদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দি-ফিকিরের অনুসন্ধানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কব্জীতে গুলী মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তারই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিল ও-রেলি লড়ায়ে যাবার জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রংরুটের অসুবিধা হবে বলে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই জনপঞ্চাশেক বাঙালী ছোকরাকে রিক্রুট করেছে এবং তার ভিতর গোটা পাঁচেক টেররিস্টও আছে।

ও-রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে এক বাক্যে বললে, শাবাশ।

পুলিশের ক্লাবে আই জি এসেছিলেন মধুগঞ্জ টুরে। ক্লাবে বসে ও-রেলির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রতি গর্ব অনুভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়া-ঝুনা সব সদস্য দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্রু হলেন সবচেয়ে বেশি।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাত্রে, পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার সুব্যবস্থা করে। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়ফাট্টাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে-সব ভাই-বেরাদের সাতজন্মে কখনো লড়াই দেখে নি তারা যেতে আরম্ভ করলো ইরাকে। তাই নিয়ে পূর্ব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়,
দেখছ নি দালান?
ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু পানিৎ ল্যামা তারা
পিস্তল মারাৎ যায়—
মিয়া গেছলায় যে বসরায়, মিয়া গে— (সম)!

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনা'শক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে কিন্তু সায়েবদের ছেলেমানুষী কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ বেয়ারাগুলো পেল যেদিন মধুগঞ্জের পাগলা চেঁচিয়ে গান ধরলে,

মরি, রাই, রাই, রাই
জর্মনিরে ধরে এনে,
হার্মনি বাজাই !

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা—পাগলা জগাইয়ের 'গানে' কখনো থাকতও না—অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলকে ডেকে এনে ক্লাবে তার 'নৃত্যসম্বলিত' গান শোনা হল, প্রচুর বখশিশ দেওয়া হল, এবং তাকে একটা মেডেল দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনাও হল।

'বাঙাল' গাছে ফলে না, 'বাঙালে'র চাষ পূব-বাঙলার এক-চেটে নয়, তাই সায়েবদের 'বাঙালপনা' দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর এক পেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে 'জঙ্গীলাট' !

রাত্রে আই জি'র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলোয়।

সুপ শেষ হতে না হতেই ডি এম-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দু'জন মারা গিয়েছে—ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই জি বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা

একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোট লোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে —মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মত খাপসুরৎ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওকিব-হাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানি সায়েবদের যারাই দিশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়েব সায় দিলেন, তারপর ভরসা দিলে লড়াই শিগগিরই খতম হয়ে যাবে—সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন—খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু' পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়েব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়েব তাই নিয়ে প্রশংসা এবং বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলিতি নয়, এ জিনিস তৈরি হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েবের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নূতন সেভারি আবিষ্কার করেন। খয়রুল্লার মতে তাঁর মত পাকা রাধুনি এদেশে কখনো আসে নি। সে তখন

জয়স্‌র্যের মেট—তার কাছ থেকে সে এ-জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে। তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্য আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা মেম সায়েব তো এখন বিলেতে?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'সে কি, হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জানো না?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। পুলিস সাহেবের বেয়ারা হিসেবে জাতভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে সে দুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কিনা সায়েব পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার কোন খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েবই। তা, তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাকে শুধাতে যাবে কে?'

বড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। সায়েব মেমদের নিয়ে চাকরনফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, 'ঠিক বলেছো।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব যদি বা কথার মোড় ফেরালেন, সে তার সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মর্জি করেন ?

ডিনার শেষ হলে পর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব তদ্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সাহেব সোজাসুজি জিগ্যেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জানো ?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন ? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি ?'

'না, তো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেতে না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকলো।'

ডীন বললে, 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেব্‌ল্ এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে-কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বি—আমাকে এখানে আমার আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফেমিলি এ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ!'

আরো পাঁচ রকমের কথা হ'ল—বিশেষ করে লড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দু'জনেই ইয়কশারের লোক, কাজেই দু'জনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাদুরী, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হ'ল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ক্রেম দ্য মাঁৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?'

ডীন যেন শুনতে পায় নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বাগদাদের কাজীর গল্প জানেন?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হ'ল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'না তো।'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায়? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো

দেখে নি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে এক দিন আঙ্গিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে একঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালালো। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিন খাওয়ার সময় তিনি হাত-তালি দিলে দুসরা ট্যাংও বেরতো।'

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প, কিন্তু—'

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কি? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হুইস্কি খেতে—ত্রিমূর্তি হুইস্কির চোখে দেখেছিলুম কি না! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।'

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা'—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, 'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনির স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে—'থ্রাইস ওথ—তিন সত্যি।'

তেরো

লড়াইয়ের জন্য টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা 'আওয়ার ডে', পূব বাঙলার এই প্রথম ফ্লেগ ডে। নেটিভরা বিদ্রূপ করে 'আওয়ার ডে'-কে নাম দিলে 'আওর দে' অর্থাৎ 'আরো দে'। ওদিকে ভারত-বাসীদের কাছ থেকে এ দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকের অভাব-অনটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গৌরবও কমে যাওয়াতে পূব বাঙলায় আরম্ভ হ'ল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ-অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা ঠেকানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও-রেলির এলাকায় কোনো বাজার লুট হয় নি। আই জি গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও-রেলির কাছ থেকে সলা-পরামর্শ নিতে।

ও-রেলির বাংলোয় বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে 'পট্‌লাক্' খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হ'ল। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, 'লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিস্‌টিকস্ কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কি রকম আছে?'

'ভালোই।'

'চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছো তো?'

'হুঁ'। তারপর বলল, 'ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখো হতে দিই নে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।'

বড় সায়েব বললেন, 'সরি! কিছু মনে করো না, ও-রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করি নে; নিজের দুশ্চিন্তারই আমার অবসান নেই।'

ও-রেলি চুপ করে রইল।

মাস দুই পর বড় সায়েব ডীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় ডীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি।

প্রায় দু'মাস হল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জানো—তার জন্য ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে-কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ

জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হুনদের তাঁবেতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও আমি করতে পারিনে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে—তার কার্যপন্থা ও সফলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর দিয়ে সে আমার দিকে যেভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হ'ল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হ'ল, তার সম্বন্ধে আমরা যেসব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁচেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হ'ল, এ-বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই।

আর যদি আমাদের প্রফেশনের কথা তুলি তবে বলবো, 'তুমি আমি পুলিশ ; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিশ একথা ভুলে গিয়েছে।'

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেব্‌ল্‌ এবং তার বাচ্চা কোন্‌ মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও-রেলিকে মসুরিতে নাকি মেব্‌ল্‌দের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল —সব ক'টা ইয়োরোপীয় হোটেলে অনুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও-রেলির নাম সাভয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইয়োরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে বেশি দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্ম নামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেত যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাঙ্ক বেরল তখন আমি মেব্‌ল্‌দের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরে নি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন্ পথে এগতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস দিতে পারো ?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয় গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও-রেলি খবর পেয়ে মর্মাহত হয় যে, আমিও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের* মত কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও-রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে-কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ
ডাড্‌নি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ডীনের কাছ থেকে একখানি ছোট চিঠি পেলেন।

'যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আসুন ; সব আলোচনা মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পৌঁছলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? ডীন উত্তর না দিয়ে শুধু ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

* টী-চেস্ট বা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে বলে চা-বাগিচার সাহেবদের অবজ্ঞার্থে অন্য ইংরেজ নাম দিয়েছে 'বক্সওয়ালা'। হিন্দী 'ওয়ালা' অব্যয় ব্যবহার করা অর্থ যে তারা 'হাফ-নেটিভ'।

রাত্রে ডিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ডীন বড় সাহেবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গেল।

সায়েব দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দু'জনে বারান্দায় ফিরে এলেন। বড় সায়েব একটা নির্জলা বড় হুইস্কি খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'কোথায় পেলে?'

'বাগানে লিচু গাছের তলা খুঁড়ে।'

'কি করে সন্দেহ হ'ল?'

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, মেব্‌ল্‌দের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাস করে আপন অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেষ করলুম।

এ বাংলোয় প্রথম দু' রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। যে গাছ-তলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাসীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন, কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্য হক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।

জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ; যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবো।'

বড় সায়েব দু' হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলে।

সায়েব শুধালেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায় নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কাজ যদি ও-রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভবপর হত না।'

ডীনও উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও-রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কালগুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।'

বড় সায়েব বললেন, 'মাই কেস! ও গড্।'

বড় সায়েব পরদিনই রাধাপুর গিয়ে সোজা উঠলেন ও-রেলির বাংলোয়। কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন,

'ও-রেলি, মধুগঞ্জে তোমার বাংলোর বাগান খুঁড়ে তিনটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে কি? কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—তুমিও জানো—'

সাহেব বাক্য শেষ করলেন।

ও-রেলি তখন একটু শুকনো হেসে বললে, 'আমাকে কিছু সাবধান করতে হবে না। এই নিন।' বলে সে কোটের ভিতরে বুকের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বড় সায়েবের হাতে দিলে।

চৌদ্দ

প্রিয় সোম,

এ চিঠিটা তোমাকে লিখছি ; এ চিঠিটা বিশ্বসংসারের যে কোনো লোককে লেখা যেত। তবু তোমাকেই কেন লিখছি তার কারণ তুমি আমাকে হৃদয় আর মন দিয়ে যেরকম বুঝতে চেষ্টা করেছো এ রকমটা আর কেউ কখনো করে নি—না এদেশে না আমার আপন দেশে—এক মেব্‌ল্ ছাড়া। 'হৃদয় আর মন' দিয়ে বলবার সময় আমি ইচ্ছে করেই 'হৃদয়' আগে ব্যবহার করেছি ; তার কারণ আমি আইরিশম্যান, আমি ইংরেজ নই। আমি আমার পাঁচটা জাতভাইয়ের মত হৃদয় দিয়ে ভাবি, আর মন দিয়ে অনুভব করি। ইংরেজ তার মনকে হৃদয়ের আগে স্থান দেয় এবং বহু ইংরেজের আদপেই হৃদয় আছে কিনা তাই নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু থাক, এসব সস্তা পাইকারি হিসেবে কোনো জাত কিম্বা দেশ সম্বন্ধে রায় প্রকাশ। শুধু শেষ একটা কথা বলি, বাঙালীর সঙ্গে এ বাবদে আইরিশ-ম্যানের অনেকখানি মিল আছে। জানিনে, তোমার কাছে খবর পৌঁচেছে কিনা, আলীপুরের মামলায় যারা হাজতে ছিল তাদের

প্রতি দরদ দেখিয়ে এক আইরিশ ডাক্তারকে এদেশের ইংরেজ কর্তাদের কাছে হুম্‌কি খেতে হয়েছে। এই আইরিশ ডাক্তারের সঙ্গে আমার এবং তোমার হৃদয়ের মিল রয়েছে। দেশে আমার জাতভাইরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে স্বাধীনতার জন্য। তাদের জন্য আমার হৃদয়ে যথেষ্ট দরদ। ওদিকে ইংরেজ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকেও অস্বীকার করতে পারিনে। তোমার বেলাও তাই, অরবিন্দ-কোম্পানীর প্রতি তোমার সহানুভূতি; ওদিকে যে ইংরেজ রাজতন্ত্র এ-দেশে প্রচলিত তার সদ্‌গুণগুলোও তোমার চোখ এড়ায় না। আইরিশ ডাক্তার, তোমার এবং আমার, আমাদের সকলের ভিতর একই দ্বন্দ্ব।

সাধারণ লোক এক্ষেত্রে বলে, 'তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই পারো!'

এর সদুত্তর যখন আমি আপন মনে খুঁজছি তখন তোমার মুরুব্বি—যাকে প্রথম দর্শনে মনে হয়, আস্ত একটা গড্‌-ড্যাম ফুল—কাশীশ্বর চক্রবর্তীকে এক পুরস্কার সভার বক্তৃতাতে অন্য কথা প্রসঙ্গে বলতে শুনলুম, 'সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব সংসারে তো চিরকালই লেগে থাকবে; তাই বলে কি আমরা সবাই সংসার ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাই? আর যদি যাই-ও, তা'তেই বা কি? সেখানে কি দ্বন্দ্ব নেই?'

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়লুম! কিন্তু তোমার স্মরণ আছে, সোম, আমি যখন প্রথম এদেশে আসি তখন কী রকম মারাত্মক বাচাল ছিলুম। তুমিই নাকি মীরপুরকে একদিন

বলেছিলে, 'সায়েব কথা কয় যেন ম্যাক্সিম্ গানের মত—কট্ কট্ কট্ কট্-ট্-ট্-ট্!' ঠিকই বলেছিলে। এবং আমিও মন্তব্যটা শুনে সেটাকে সবিশেষ প্রতিপন্ন করার জন্য আরো শ' তিনেক রৌণ্ড তদ্দণ্ডেই ছেড়েছিলুম।

সে বাচালতা একদিন আমার লোপ পায়। আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে। দীর্ঘ সাত বছরের জমানো কথা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি। যে কলম-ধরাকে আমি ভূতের মত ডরাতুম, আজ আমাকে সেই কলম ধরেছে। আমার একমাত্র দুঃখ এ-চিঠি হয়ত কোনোদিন তোমার হাতে পৌঁছবে না। এটা হয়ত জবানবন্দীরূপে আদালতে পেশ করা হবে। যে অন্ন তোমাকে সাদরে আপন হাতে খাওয়াতে চেয়েছিলুম, সেটা পৌঁছবে তোমার কাছে, পাঁচশো জনের এঁটো হয়ে।

হ্যাঁ, আমার-ই কর্ম, আমিই করেছি। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। আমি একাই দায়ী। আমি জানি, একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে যে, আমি দায়ী। তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও নি কেন তারও আন্দাজ আমি খানিকটা করতে পেরেছি। বিশ্বের আদালতে আমাকে খাড়া না করে তুমি আমাকে তোমার নিজের আদালতে খাড়া করে হয়ত যথেষ্ট প্রমাণ পাও নি, হয়ত তোমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, এ অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই রকম ধারাই করতে, হয়ত ভেবেছিলে আমি তোমার ওপর-ওলা, ওপর-ওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপর-ওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিম্মেদারী। এ নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জজ যখন আসামীকে

খালাস দেয় তখন জজ কেন তাকে ছেড়ে দিলে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় কোন্ আসামী ?

তুমি যে আমাকে হৃদয় দিয়ে খানিকটে বুঝতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে, এইবারে আমি তোমাকে হাত ধ'রে বাকিপথটুকু নিয়ে যাবো। কিন্তু যদি গুপ্তধনের কলসী তখন ফাঁকা বেরোয়, কিম্বা যদি তার থেকে বেরয় কেউটে…? তখন তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আর তুমি যদি তখন তোমার রায় বদলাও তবে আমিও তোমাকে দোষ দেব না।

তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

একদিন কথায় কথায় আমি তোমাকে আমার বাপ-মা সম্বন্ধে কি যেন সামান্য কিছু একটা বলি। তুমি সুযোগ পেয়ে এমন একটা প্রশ্ন শুধালে যার থেকে আমি আব্‌ছা-আব্‌ছা বুঝতে পারলুম, তুমি জানতে চাও আমি আমার রক্তে এমন কোনো দ্বন্দ্ব নিয়ে জন্মেছি কিনা যার তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি অপরাধের পন্থা বরণ করলুম। এখানে বলে রাখি, সে স্থলে তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতুম। কারণ অপরাধী নিয়ে আমাদের কারবার। হয় তাদের গায়ে বদ-খুন,—না হয় তারা বড় হয়েছে বদ আব-হাওয়ার ভিতরে। আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই তবে এটুকু এখনো স্মরণে আছে যে, তুমি কিন্তু প্রশ্নটি করেছিলে এমনি সুচতুরভাবে যে, আমি কোনো অফেন্‌স্ নিই নি।

তাই বলে রাখি, আমি আমার বাবার যেটুকু দেখেছি তার থেকে এমন কিছুই মনে পড়ছে না যা দিয়ে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, অর্থাৎ দু' মুঠো অন্ন আর তিন পাত্তর মদের পয়সা হয়ে গেলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে সোজা চলে যেতেন পাড়ার মদের দোকানে—তারপর তাঁকে আর এক মিনিটের তরে কাজ করানো যেত না। তুমি আয়রল্যাণ্ডের মদের দোকান কখনো দেখ নি, তাই তুলনা দিয়ে বলছি, সে হল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর বৈঠকখানার মত। সেখানে কুঁড়েমি আর গালগল্প ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হয় না—মদ সেখানে আনুষঙ্গিক মাত্র। মেয়েদের সামনে এসব জিনিস ভালো করে জমে না বলে মেয়েরা 'পাবে' যায় না, চক্রবর্তীর বৈঠকখানায়ও তাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার বাবা ছিলেন গল্প বলায় ওস্তাদ, তাই তিনি ছিলেন 'পাবের' প্রাণ—চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় শুনেছি সেই ব্যবস্থা।

তাঁর কোনো প্রকারের চরিত্রদোষ ছিল না, তাঁকে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আমি কখনো দেখি নি। অথচ তিনি আমাকে জীবনে একটিমাত্র যে উপদেশ লক্ষাধিকবার দিয়েছেন সেটি—'ডেভিড, যা খুশি তাই করবি, কারো পরোয়া করিস নি।' কেন তিনি এ উপদেশ দিতেন জানিনে, এর ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা সে তুমি ভেবে দেখো। মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, তিনি মৃদু আপত্তি জানাতেন। বাবা তখন অন্য কথা পাড়তেন, কিন্তু যেদিনই ঝড় দুর্যোগে 'পাব' যেতে পারতেন না, সেদিনই আমাকে মজাদার কেচ্ছা-কাহিনী

শোনাতেন এবং তার সবগুলোতেই ইঙ্গিত থাকতো,—'যা খুশি তাই করো', এমন কি 'যাচ্ছেতাই করো।'

এ উপদেশ কিন্তু আমার মনের উপর কোনো দাগ কাটতে পারে নি—অন্তত তাই আমার বিশ্বাস।

এ ধরনের পরিবার আয়ারল্যাণ্ডে বিস্তর—এর মধ্যে কোনো বিদ্‌ঘুটে নূতনত্ব নেই। এর থেকে আমি কোনো হদিস পাই নি—দেখো, তুমি পাও কি না।

তবে কি বাইরের দূষিত আবহাওয়া? এমন কোনো পৈশাচিক ঘটনা যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, এবং সেই স্তম্ভনের সময় আমার অজানাতে সে ঘটনা আমার হৃদয়মনে ঢুকে গিয়ে দুষ্ট জীবাণুর মত বছরের পর বছর ধরে আমার সর্ব অচেতন সত্তা বিষিয়ে দিয়ে দিয়ে শেষটায় হঠাৎ একদিন আমার মগজে ঢুকে আমাকে বিবেকবুদ্ধিহীন উন্মাদ করে দিলে? কিম্বা কোনো মারাত্মক প্রবঞ্চনা,—যে-দেবীকে হৃদয়ের পদ্মাসনে বসিয়ে দিনযামিনী পূজা করেছি, হঠাৎ দেখি সে মায়াবিনী, পিশাচিনী—আমার বুকের উপরে বসে আমারই হৃদপিণ্ড ছিন্ন করে রক্ত শোষণ করছে? কিম্বা প্রেমের দেউলের মমতা-প্রতিমা গোপনে গোপনে বারাঙ্গনার আচরণ করছে—হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল, আমার বিশ্বসংসার অন্ধকার হয়ে গেল?

না। আমার চোখের সামনে ঘটে নি। শুনেছি। তা সে তুমিও শুনেছ, সবাই শুনে থাকে, বইয়ে পড়ে থাকে।

তবে কি উল্টোটা? অবিশ্বাস্য আত্মবিসর্জন, বহুযুগের

বিরহদহনের পর মধুময় পুনর্মিলন, সমরে লুপ্ত পুত্রের গৃহ-প্রত্যাগমনে মাতার বিগলিত আনন্দাশ্রু সিঞ্চন ?

না। তাও দেখি নি। সেখানেও ইউ উইল ড্র ব্ল্যাঙ্ক !

তবে হাঁ, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, মেব্‌ল্‌কে দেখা, তাকে পেয়েও না-পাওয়া।

পনর

আমার বাবা মা দুজনই এক মাসের ভিতর মারা যান। আমি বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে পড়াশুনো করতে এলুম।

আমার মনে হয় বড় শহরে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন। অকস্মাৎ সাজ্ঘাতিক সেখানে কিছু একটা ঘটে না। তার কারণ বড় শহরের জীবনস্রোত বয় অতিশয় তীব্র গতিতে। তুমি তার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছ খরবেগে। সে বেগে চলার সময় ডাইনে বাঁয়ে মোড় নেওয়া অসম্ভব। আর ছোট শহর, কিম্বা গ্রামে জীবনগতি শান্ত মন্দ। সে যেন গ্রামের নদী। তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় সামান্য খড়-কুটোটি নানা চক্করে বহু প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হয় তার জীবনে স্বাধীনতা অনেক বেশি।

মানুষের জীবনের উপর লণ্ডনের চাপ জগদ্দল, তার দাবি বহুল—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি মানুষ যে কি বদ্ধ পাগলের মত ছুটোছুটি হুটোপুটি করে সেই তুমি মধুগঞ্জের লোক বুঝবে কি করে? এবং যতদূর দেখতে পাচ্ছি, থ্যাঙ্ক গড্, মধুগঞ্জকে কখনও বুঝতে হবে না।

কিন্তু জানো সোম, সেই খরস্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ আমি একদিন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলুম। দেখি সমুখে ঘন নীল সমুদ্র আর তার উপর ফিরোজা আকাশের ঢাকনা। বিলেতের সমুদ্র আর আকাশ সচরাচর নীল রঙের বাহার ধরতে জানে না—কুয়াশা, বৃষ্টি আর বরফ তাকে করে রাখে ঘোলাটে, তামাটে, পাঁশুটে। আমার সঙ্গে সমুদ্রের চারি চক্ষের মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে—নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণ শেষে আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

সে সমুদ্র মেব্‌ল্।

তোমাকে বোঝানো অসম্ভব, সোম, কারণ এ জিনিস বোঝার জিনিস নয়। তোমার বহু সদগুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রেম কি বস্তু তা তুমি জানো না। কতবার দেখেছি, ছোঁড়া-ছুঁড়ি পালিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারী করেছে, তুমি সর্বদাই সমাজের হয়ে তাদের উপর কড়া শাসন করেছ, পুলিশের কুলিশ পাণি দিয়ে। তারা কিসের নেশায় পাগল হয়ে সমাজের সব বেড়া ভাঙল, সব দড়াদড়ি ছিঁড়ল তুমি কখনো বুঝতে পারো নি। আমি দু'একবার ইঙ্গিত করে দেখেছি তুমি অন্ধ, বরঞ্চ নৈতিক, সামাজিক ধর্ম রক্ষা করা যার সর্বপ্রধান কর্তব্য সেই পাদ্রী বুড়োবুড়ীর হৃদয়ে অনেক বেশি দরদ, তাদের চিত্ত বহুগুণে প্রসারিত।

মেব্‌ল্ সেই গ্রীষ্মের দুপুরে হাইড পার্কের গাছতলার বেঞ্চিতে বসে অলস নয়নে সার্পেণ্টাইনের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল।

তুমি তাকে দেখেছ, বহুবার বহু পরিবেশে দেখেছ, অবশ্য আমার চোখ দিয়ে দেখ নি, কিন্তু তুমি জানো সে সুন্দরী। অসাধারণ সুন্দরী।

হিন্দুধর্ম, হিন্দু দর্শনের অনেক কিছু আমি এদেশে এসে শুনেছি, পড়েছি ; কিন্তু তার অল্প জিনিসই আমি বিশ্বাস করতে শিখেছি। তার একটা, জন্মান্তরবাদ। না হলে কি করে বিশ্বাস করি সেই সামাজিক কড়াক্কড়ির যুগে বিনা মাধ্যমে কি করে আমাদের আলাপ হ'ল, প্রথম দর্শনেই কি করে দুজনার হৃদয়ে একে অন্যের জন্য ভালবাসা জন্মাল ? এ যুদ্ধ বিলেতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অজানা মানুষের সঙ্গে বিলেতে আলাপ পরিচয় করা এখন আর কঠিন নয়, তার ধাক্কা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের আণ্ডাঘরেও এসে পৌঁচেছে, সে খবর তুমি জানো, কিন্তু সে যুগে দু'দণ্ডের ভিতর এতখানি হৃদ্যতা পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া অন্য কোন স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে বোঝানো যায় না।

মেব্‌ল্ আমার কাছে সমুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

সে সমুদ্র আমাকে নিদাঘে শীতল করেছে, শীতে আতপ্ত তৃপ্তিতে সর্ব সত্তা ব্যাপ্ত করে ভরে দিয়েছে।

বিলেতে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে সময় লাগে। সংসার চালাবার মত রোজগার করতে করতে বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে যায়। আমার কিন্তু একদিনও তর সইছিল না। তাই আমি চাকরি নিলুম ভারতবর্ষে। যে মাইনে প্রথম চাকরিতে ঢুকেই এখানে পাওয়া যায় তাই দিয়ে অনায়াসে দুটো সংসার

পাতা যায়। কিন্তু মেব্‌ল্‌কে বললুম, 'দাঁড়াও, দেশটা প্রথম দেখে আসি, তোমার সইবে কি না।' মেব্‌ল্‌ আপত্তি জানিয়েছিল, সে তখন আমার সঙ্গে নর্থ পোল, সেন্ট্রল আফ্রিকা সর্বত্র যেতে তৈরী। আমি কিন্তু তখন তাকে দিতে চেয়েছিলুম এমন কিছু যার জন্য তাকে আমাকে যেন পরে পস্তাতে না হয়। যদি দেখি ভারতবর্ষের বাতাবরণে আমাদের প্রেম তার পরিপূর্ণতা পাবে না, তবে ফিরে যাবো বিলেতে, না হয় বছর কয়েক খেটে সেখানেই সংসার পাতব।

বোম্বাই কলকাতা দু'জায়গাতেই আমার মন কিন্তু কিন্তু করেছিল কিন্তু পাদ্রীর টিলার মোড় ঘুরে মধুগঞ্জে পৌঁছতেই আমার মন থেকে সর্ব দ্বিধা অন্তর্ধান করলো। এ যে আমার আয়ারল্যাণ্ডের পাড়াগাঁকেও হার মানায়। এই বক্‌স্‌ওলারা কেন যে ভ্যানর-ভ্যানর করে মধুগঞ্জের নিন্দে করে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, বোধহয় করাটা ফ্যাশান, কিম্বা হয়ত ভাবে, না করলে খানদানী সায়েবরা ভাববে ওরা বুঝি নেটিভ, কালা আদমী বনে গিয়েছে।

লণ্ডন থেকে মধুগঞ্জ! এর চেয়ে দূরতর পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারিনে।

সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অকৃপণ-ভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর তাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাদ্রী টিলার মেয়েগুলি।

ভালোই। এদের কথা উঠলো। তুমি জানো আমি ওদের

সঙ্গে ঢলাঢলি করার মৎলব নিয়ে পাদ্রী-টিলায় যাই নি, কিন্তু এক জায়গায় আমার অজানাতে আমি একটা ভুল করে ফেলি। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা যে এত স্পর্শকাতর হয় আমি অনুমান করতে পারি নি তাই আমি তাদের সামান্যতম গতানুগতিক হৃদ্যতা জানাতেই হঠাৎ দেখি, ওরা দিচ্ছে তরুণীর অকুণ্ঠ প্রেম। আমার আপসোসের অন্ত নেই যে, সে ভালোবাসার ন্যায্য সম্মান আমি দেখাতে পারি নি। আশা করি ওরা জানতে পেরেছে যে, আমি ওদের ফিরিঙ্গ বলে অবহেলা করি নি। আমি জানতুম, তুমি এই বিশ্বাসটি ওদের ভিতর জন্মাতে পারবে তোমার পাকা মুন্সিয়ানা দিয়ে, তাই তোমারই হাতে এটি সঁপে দিয়েছিলুম।

তারপর আমি বিলেতে গেলুম মেব্‌ল্‌কে নিয়ে আসতে।

এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সর্বত্রই প্রতি মুহূর্তে নরনারীর ভিতর প্রেম মুকুলিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে, তার ফল কখনো মধুময় কখনো তিক্ত—এই হ'ল জীবনের দৈনন্দিন, গতানুগতিক ধারা। কিন্তু যদি প্রেমের মেলা দেখতে চাও, প্রেম যেখানে অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উপছে পড়ছে তবে একটিবারের জন্য কোনো এক জাহাজে করে সপ্তাহ তিনেকের জন্য কোথাও চলে যেয়ো। দেখবে কী উন্মাদ অবন্ধন মেলার ফুর্তি সেখানে চলে—ইচ্ছে করেই 'মেলা' বলছি কারণ, এ জিনিস দৈনন্দিন নয়। জাহাজের অধিকাংশ নরনারী সেখানে সমাজের সর্বপ্রকার কড়া বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রতিবেশীকে ডরিয়ে চলতে হয় না পাছে সে কেলেঙ্কারী কেচ্ছা সর্বত্র রটিয়ে দেয়—জাহাজ

মোকামে পৌঁছলেই তো সবাই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কে কাকে জানাতে যাবে, কে কি করেছে? এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ তিন হপ্তা মানুষ জীবন-সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকারের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ মুক্ত। আহার নিদ্রা আশ্রয়—এ তিন সমস্যার সমাধান হওয়া মাত্রই, তা সে যত সাময়িকই হোক না কেন,—তিন সপ্তাহ কি কম সময়?—মানুষের জাগে আসঙ্গলিপ্সা, যৌনক্ষুধা। সে যেমন বিরাট তেমনি বিকট—স্থল বিশেষে। তাই এ রকম জাহাজে মানুষ এডনিস না হয়েও পায় কার্তিকের কদর, মোনা-লিসা না হয়েও পায় ভিনাসের পূজা।

বৃথা বিনয় করব না। আমি জানি আমি কুরূপ কুচ্ছিৎ নই। তাই আমার কাছে তখন বহু হৃদয় অবারিত দ্বার, বহু যুবতী আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছেন। আর দু'চারটি ভীরু লাজুক তরুণী নির্জনে পেলে ফিক করে একটুখানি হেসে কিশোরী-সুলভ নাতিস্ফীত নিতম্বে সচেতন ঢেউ তুলে দিয়ে জাহাজের নির্জনতর কোণের দিকে রওয়ানা দিত।

কিন্তু আমি তো চলেছি আমার বধূর সন্ধানে। আমার ফিয়াঁসে, যে আমার ব্রাইড হতে যাচ্ছে, আমার বঁধূ যে আমার বধূ হতে চলেছে। প্রপেলারের প্রতি আঘাত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ, হাজার হাজার টাকার বেতনভোগী কর্মচারীরা এরা সবাই অহোরাত্র খাটছে আমাকেই, শুধু আমাকেই, আমার রাণীর কাছে নিয়ে

যাবার জন্যে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় এ জাহাজ ডুবতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেলেও এ জাহাজ পৌঁছবে মার্সেলেস বন্দরে, যেখানে জাহাজ থেকে দেখতে পাবো, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন মেব্‌ল্‌ যে পোশাক পরে হাইড পার্কে বসেছিল সেই পোশাক পরে বন্দরের পারে দাঁড়িয়ে তার মভ্‌ রঙের রুমাল দোলাচ্ছে।

'ভগবান কোথায়?'—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কৃচ্ছ্র সাধনাসক্ত দীর্ঘ তপস্যারত, চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, 'তরুণ তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।' আমার হৃদয় আমার মেব্‌লের রুমাল-নাড়ার মাঝখানে থাকবেন স্বয়ং ভগবান।

থাক্‌, সোম। আগেই বলেছি তোমাকে এ-সব বলা বৃথা। তবু বলছি, কেন জানো। হয়ত বুঝতে পারবে, হয়ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। অবিশ্বাস্য তো কিছুই নয়, অসম্ভবই বা কোথায়?

ষোল

তুমি যে সব ইংরেজদের চিনেছ তাদের ভিতর সত্যকার শিক্ষিত লোক কম। এবং যে দু একটি লোক সাহিত্য বা অন্য কোনো রসের সন্ধান কোনো কালে বা হয়ত রাখত তারাও আণ্ডাঘরের আবহাওয়ায় পড়ে এবং রসকষহীন সরকারী বেসরকারী কাজ করে করে স্থূল এবং অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। শেলি, কীটস পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার জন্য বহুদিন বহু বৎসর ধরে মনে মনে হৃদয়ের অন্তস্তলে এক বিশেষ 'ধর্মসাধনা' করতে হয়। অল্প ইংরেজই সেটা করে থাকে, এবং করলেও সে আর পাঁচ-জনকে সে সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। তাই ইচ্ছে করেই 'ধর্মসাধনা' সমাসটা ব্যবহার করলুম, কারণ তোমরা ঐ জিনিসকে করে থাকো গোপনে গোপনে। আমার মনে হয় দুটো একই জিনিস, ধর্মসাধনা এবং কাব্যসাধনার শেষ রস একই।

ফরাসীরা তোমাদের মত। শক্ত সোমত্থ জোয়ান যদি গালগল্পের মাঝখানে হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করে তবে আর পাঁচটা ফরাসী হকচকিয়ে ওঠে না, কিম্বা বিষম খায় না। ফ্রান্সে তাই কাব্যজীবন এবং ব্যবহারিক জীবনের ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাদের প্রেম যে রকম অনেকখানি খোলাখুলি, সে প্রেমকে তারা তেমনি কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে আর পাঁচ

জনের সামনে রূপ দিতে, প্রকাশ করতে লজ্জিত হয় না। তাই ইংরেজ হনিমুন করতে যায় ফ্রান্সে—জীবনের অন্তত ঐ কটা দিনের জন্য সে খোলাখুলি প্রেম করতে চায়। তার জীবনের এ কটা দিন তোমাদের হোলির মত। মাতব্বর কাশীশ্বর চক্রবর্তীকেও সেদিন আমি রং মেখে সং সেজে ঢং করতে দেখেছি। মুরুব্বী রায় বাহাদুর যদি প্যারিসে হনিমুন করতে যেতেন (ভাবতেই কি রকম হাসি পায়—প্যারিসের রাস্তায় চোগা চাপকান পরা রায় বাহাদুরের সঙ্গে নোলক পড়া চেলিতে জড়ানো আট বছরের বউ!) তবে তিনি অতি অবশ্য রাস্তার পাশের গাছতলায় দাঁড়িয়ে খনে গলায় ঝুলানো হারমনিয়ামের প্যাঁ প্যাঁর সঙ্গে ভাটিয়ালী ধরতেন, খনে বউয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে খেমটা কিম্বা পল্‌কা নাচ জুড়তেন। ফ্রান্স দেশের বোতলেই শ্যামপেন নয়, তার আকাশে বাতাসে শ্যাম্পেন ছড়ানো।

মার্সেলেস থেকে দশ মাইল দূরে ছোট্ট শহর অ্যাক্‌স-আঁ-প্রভাঁসে আমরা বিয়ে করব বলে স্থির করলুম। বিয়ের ব্যবস্থা করতে করতে যে তিনদিন লাগলো সে সময়টা আমরা মার্সেলেসের সেরা হোটেলে কাটালুম আলাদা কামরায়—তখনো বিয়ে হয় নি, এক ঘর করি কি করে? ফরাসীরা তাই দেখে কত না চোখ টিপে মুচকি হাসি হাসলে। একেই বলে ইংরেজের 'লেফাফা-দুরুস্তমি', ব্রিটিশ প্রুডারি, তোমাদের ভাষায় এদিকে ঘোমটা, ওদিকে খেমটা!

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরে যে যেতে পারতুম না

তা নয়। এমন কি হোটেলওয়ালা বুদ্ধি করে আমাদের যে দু'খানা ঘর দিয়েছিল তার মাঝখানে একটি দরজা ছিল। সে দরজাটি ওয়ালপেপারের সঙ্গে এমন নিখুঁত কারিগরিতে মেশানো যে, আমাদের কারো নজরেই পড়ে নি। যে লিফ্‌ট্‌-বয় আমাদের সুটকেশ ঘরে নিয়ে এসেছিল তার বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রেমের মন্দিরে আমরা একদম গাঁইয়া ভক্ত, আর ফরাসীরা সেখানে আমাদের তুলনায় বিদগ্ধ নাগরিক পাণ্ডা। অর্থাৎ ফরাসী লিফ্‌ট্‌-বয় পর্যন্ত বিলেতের ডন জুয়ানকে প্রেমের মুশায়েরায় দু' চারখানি মোলায়েম বয়েৎ শুনিয়ে দিতে পারে। একবাক্য ইংরিজি না ব'লে ছোকরা অতিশয় সংস্কৃত কায়দায় শুধু মুদ্রা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে দরজাটা কোন্ জায়গায় এবং সেইটেই যেন আসল কথা নয়, যেন আসল কথা—ওটাকে দু'দিক থেকেই বন্ধ করা যায়। মেবলের মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

যে দরজা বন্ধ করা যায়, সেটা খোলাও যায়। বাঙলা কথা।

জানিনে, মেব্‌ল্ তার দিকটে খোলা রেখেছিল কি না।

তোমাদের রাধাকেষ্টর দেখা হত কুঞ্জবনে, সেখানে দরজা-দেউড়ির বয়নাক্কা নেই। আমাদের দেশে দরজা নিয়ে বিস্তর কবিত্ব করা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তোমাকে সে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম।

আমি কিন্তু যাই নি অন্য কারণে। যাকে দু'দিন বাদে সব দিক দিয়ে আমি পাবই পাবো, যে খনির সব মণি একদিন আমারই হবে, যে সমুদ্রের সব মুক্তা আমারই—একমাত্র

আমারই গলায় একদিন তুলবে, সে খনিতে আমি ঢুকতে যাবো কেন চোরের মত, সে সমুদ্রে আমি কেন হতে যাব বোম্বেটে? মেব্‌ল্‌কে আমি বরণ করতে যাব বিশ্বসংসারের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, যৌন সম্পর্কে যদিও আমার দেশ তোমাদের তুলনায় অনেকখানি ঢিলে তবু ও জিনিসটে আমার কাছে কখনো সরল বলে মনে হয় নি। আমার মনে কেমন জানি একটা ভয়, কি যেন একটা সন্দেহ সব সময়ই জেগে থাকত। আশ্চর্য, নয় কি? যে সরল রহস্যের ফলে বিশ্বসংসার প্রতি মুহূর্তে নবজীবন লাভ করেছে পশুপক্ষী, ফুলে রেণুতে যার সহজ প্রকাশ, তার প্রতি ভয়, তার প্রতি সন্দেহ! এ ভয়, এ সন্দেহ আমার এখনো যায় নি। তুমি হয়ত এ চিঠি শেষ করার পর তার কারণ আমার চেয়েও ভালো করে বুঝতে পারবে।

১৫ই আগস্ট

আমি ভেবেছিলুম, এ চিঠি আমি একদিনেই শেষ করতে পারবো; এখন দেখছি, ভুল করেছি। এত কথা যে আমার বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে সে-কথা আমি জানতুম না। আমার অজানাতে যে আমি এতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং তারও এতখানি এখনো আমার স্মরণে রয়েছে সে-তত্ত্বই বা জানবো কি করে?

ওদিকে তুমি হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ সব-কিছু এক ঝটকায় জেনে নেবার জন্য। কিন্তু সোম, জীবন তো আর রহস্য উপন্যাস নয় যে, কৌতূহল দমন না করতে পারলে শেষ ক'খানা

পাতা পড়েই সব-কিছু জেনে নেওয়া যায়। জীবন বরঞ্চ গানের মত। তার গতি বিচিত্র, তার বিস্তার বহু। আমার সে গান তোমাদের ভাটিয়ালীর মত মধুর হয় নি এবং সরলও হয় নি —তা না হ'লে আজ আমার এ অবস্থা কেন—এ গানে অনেক কমসুরা, অনেক বেসুরা। সে গানের রেকর্ড তুমি এক মিনিটে বাজাতে গেলে আরো বেসুরা ঠেকবে, আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসের একটি ছোট্ট গির্জেয় যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন বিধাতা ছিলেন আমাদের উপর অপ্রসন্ন। পুরোত যখন ভগবানের নামে একে অন্যকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন, তখন বাইরে ভগবান ছাড়ছিলেন তাঁর হুঙ্কার—বৃষ্টিঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে। অ্যাক্স্ সেদিন যে প্রথম আষাঢ়ে মধুগঞ্জ যে রুদ্ররূপ নেয় তাই নিয়েছিল। আমি যখন মেব্‌ল্‌কে বিয়ের আঙটি পরাচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে গির্জের সমস্ত রঙীন শার্সিগুলোতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেব্‌ল্ তখন শিউরে উঠেছিল। আমি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম। পুরোত যখন গম্ভীর কণ্ঠে গির্জাতে সেই গতানুগতিক প্রশ্ন শুধালেন, এই যুবক যুবতীর মিলনে কারো কোনো আপত্তি আছে কিনা, তখন কড়কড় করে বাজ পড়েছিল—আরেকটু হলে গির্জের গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মেব্‌ল্ আমাকে জড়িয়ে ধরতো। মেব্‌ল্ বড় ধর্মভীরু, আকাশে বাতাসে, ঘাসে ঘাসে সে ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলি দেখতে

পায়। আমি তার হাতে আরো একটু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছিলুম।

সেদিন কিন্তু এসব দুর্যোগ আমার মনে কোনো দাগ-কাটে নি। সেদিনের সে দুর্যোগে আমি ভগবানের করাঙ্গুলি সঙ্কেত দেখি নি, আজও দেখছিনে কিন্তু কেন জানিনে আজ যেন সমস্ত জিনিসটা এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে ধরা পড়েছে। দিনের আলোতে যে মাঠে ফুল কুড়িয়েছি, যে ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে ক্লান্তি জুড়িয়েছি, সন্ধ্যের অন্ধকারে সেখানে যেন প্রতি গর্তে কেউটের ফণা দেখতে পাচ্ছি। কি জানি, সব যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে। কতবার ভেবেছি এসব কথা। কখনো এসব এলোমেলো চিন্তা পাট করে ভাঁজে ফেলে গুছিয়ে তুলতে পারি নি।

সে রাত্রে আবেগে, উত্তেজনায় মেব্‌ল্‌ আমার বুকে তার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ-খেলানো শরীরে যেন আরেক ধরনের ঢেউয়ের পর ঢেউ জেগে উঠছিল! আমার হাত ছিল তার কোমরের উপর। আমি আমার হাত দিয়ে তার বিক্ষোভ শান্ত করার চেষ্টা করেছিলুম। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, এ দু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় হয় বেশি, রসগ্রহণ করা যায় কম। স্পর্শের মাধ্যমে পাওয়া যায় রস—অনুভূতি জ্ঞান যেটুকু সঞ্চয় হয় তা নগণ্য। স্পর্শের নিবিড়তা রসলোকে গভীরতম। সে মানুষকে একে অন্যের যত কাছে টেনে আনতে পারে অন্য কোনো ইন্দ্রিয় তা পারে না। চোখ দিয়ে যখন

প্রিয়াকে দেখি কান দিয়ে যখন শুনি তার প্রেম নিবেদন তখন সর্বচৈতন্য ভরে ওঠে এক বিপুল মাধুরীতে কিন্তু চুম্বনের ভিতর যখন তার স্পর্শলাভ করি তখন পাই গভীরতম একাত্মবোধ। বরঞ্চ চুম্বনেরও সীমা আছে, সেখানেও ক্লান্তি আছে ; কিন্তু গায়ে হাত বুলনোর কোন সীমাবন্ধন নেই। তাই মায়ের গভীরতম ভালোবাসার প্রকাশ পুত্রের গাত্রস্পর্শে। আরেকটু সাদামাঠা ভাষায় বলি, তোমাদেরই ভাষায়, মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজে না—তাতে দিতে হয় জল আর গুড়ের স্পর্শসুখ।

* * *

একটু চেষ্টা করলে হয়ত স্মরণ করতে পারবে ঠিক ঐ সময় মধুগঞ্জ অঞ্চলে হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কর্তারা বিচলিত হয়ে আমাকে তার করেন, তদ্দণ্ডেই ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে ফিরে আসতে। সে তার লণ্ডন, প্যারিস বহু জায়গায় বিস্তর গুত্তা খেয়ে শেষটায় এসে পৌঁছয় অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসে আমাদের বিয়ের পরদিন ভোর বেলায়। তৎক্ষণাৎ ছুট দিতে হল মার্সেলেস বন্দরের দিকে।

মার্সেলেস বন্দরে জাহাজ ধরা আমাদের মধুগঞ্জের বাজার-ঘাটে নৌকো ধরার মত। সেখানে তুনিয়ার জাত-বেজাতের জাহাজ—এমন কি গ্রীক, মিশরী, তুর্কী পর্যন্ত—খেয়া নৌকোর মত বসে থাকে এবং সেখানে দিব্য দরদস্তুর করা যায়, কত দামে তোমাকে ভূমধ্যসাগরের খেয়া পার করে পোর্ট সঈদ নিয়ে যাবে—মধুগঞ্জের ঘাটে যেরকম দর কষাকষি করি। মার্সেলেসে ভারতগামী বড় জাহাজ না পেলে পোর্ট সঈদে গিয়ে সেখান

থেকে অনায়াসে অন্য জাহাজ ধরা যায়—ঐ খাড়ি দিয়েই তো সব জাহাজকে বোম্বাই, কলম্ব যেতে হয়।

আমাদের কপাল ভালো না মন্দ বলতে পারবো না; কোনো ভালো ব্যবস্থাই করতে পারলুম না। শেষটায় একটা মাল জাহাজ জুটে গেল, সেটাই দেখলুম হিন্দুস্থান পৌঁছবে সক্কলের আগে, কারণ ছাড়বে ঘণ্টা তিনেক পরেই। তবে অসুবিধে এই যে, আমাদের নিজেদের জন্য কোনো কেবিন আর তাতে খালি নেই। আমাকে ঢুকতে হবে একটা পুরুষদের কেবিনে, আর মেব্‌ল্‌কে একটা মেয়েদের। একেবারে ভারতীয় ব্যবস্থা। মর্দানা জানানা।

মেব্‌ল্ খুঁৎ-খুঁৎ করেছিল।

আমি হেসে বলেছিলুম, যে দেশে যাচ্ছো সেখানে ঠিক এই ব্যবস্থা। বিলেতে স্মোকিং, নন্-স্মোকিং। ওদেশে লেডিজ এবং জেণ্টল্‌মেন।

আমার মনে হয়েছিল, ভালোই হ'ল তাড়াতাড়ির কি?

ছোট জাহাজের এক কোণে, নিভৃতে, গুটনো দড়াদড়ির মাঝখানে আমরা তুজনায় পাশাপাশি বসতুম। সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া মেব্‌লের চুল নিয়ে হুলুস্থুল বাধাতো, কখনো খানিকটে নোনা জলের সূক্ষ্ম কণা তার গালে চুমো খেয়ে যেতো, কখনো বা সমুদ্রের চাঁদের জোরালো আলো এসে তার মুখ অদ্ভুত দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলতো। রাত একটা, তুটো, তিনটে বেজে যেত। একে অন্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গসুখ বর্জন করে কেউই আপন কেবিনে যেতে রাজী হতুম না। কি হবে কেবিনে

গিয়ে। সেখানে তো শুধু ঘুমের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই। এখানে সমুদ্র-আকাশ, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-তারা তাদের কত অফুরন্ত সৌন্দর্য রাত্রের পর রাত্রি উছলে ঢেলে দিচ্ছে। কেউ দেখবার নেই। এই বিরাট সমুদ্রের ক' ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আছে ক'খানা জাহাজ? এবং সেই কটি জাহাজে সুষুপ্তিতে নিমগ্ন না হয়ে এ সৌন্দর্য পান করছে কটি নরনারী? আমিও এ সৌন্দর্য এ রকমভাবে তার পরিপূর্ণরূপে, ক্রমবর্ধমান গতিতে আগে কখনো দেখি নি। এর পূর্বে যে একবার এসেছি গিয়েছি তখন বেশির ভাগ সময় কেটেছে লাউঞ্জে তাস খেলে, 'বারে' উইস্কি খেয়ে, কিম্বা কেবিনে নাক ডাকিয়ে। 'বার' থেকে শেষ গেলাস খেয়ে কেবিনে যাবার সময় ডেকে দাঁড়িয়ে হয়ত দু পাঁচ মিনিটের জন্য টুরিস্‌ট্‌দের মত 'ও, হাই গ্র্যাণ্ড' বলেছি। পাকা ইংরেজ পাঁচজনের সমনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সাহস ধরে না—পাছে লোকে ভাবে লোকটা হয়ত কবি। 'ওয়াট? ছ্যাট চ্যাপি রাইট্‌স্‌ পোয়েম্‌স্‌? গশ্‌! ওয়া (ট) ফ (র)! মাই গিনেস্‌ (গুডনেস্‌)!' তার উপর আমি অব অল পার্সন্‌স্‌ পুলিসের লোক?

আমরা জাহাজে উঠেছিলুম কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে আর বোম্বায়ে নামি পূর্ণিমাতে।

এখানে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, সোম, কিছু মনে করো না, সেটা যদি উল্লেখ করি। এর সঙ্গে আমার মূল বক্তব্যের কোন যোগ নেই। তোমার মনে আছে কি না

জানিনে, মধুগঞ্জে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের দু'দিন পরেই তুমি কথায় কথায় বলেছিলে, 'পরশু তো পূর্ণিমা, সমস্ত রাত নৌকো বাওয়া যাবে।' আমি তখন কিছু বলি নি। পরে দেখলুম, শুধু তুমি না, তোমাদের দেশের আর সবাইও চাঁদের বাড়া-কমা সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন। আমরা কেন অচেতন থাকি তার কারণ আমাদের দেশে বারো মাস যে কোনো রাত্রে বৃষ্টি, ঝড় হতে পারে, শীতকালে বরফ, আর কুয়াশা তো লেগেই আছে চার শ' পঁয়ষট্টি দিন—ইচ্ছে করেই চার শ' বললুম। ওখানে কে হিসেব রাখে চাঁদ রাতের বেলায় কখন যায়, কখন আসে, মাজা-ঘষা কাঁসার থালার মত ঝকঝক করে, না নরুনে কাটা নখের মত আকাশ থেকে ফেটে পড়ে গাছের ডগায় আটকে থাকে।

ভারতবর্ষে চাঁদকে না চিনে মফস্বলে কোন্ পুলিশ ঠিকঠিক কাজ করতে পারে? পূর্ণিমাতে চুরির এলাকায় মোতায়েন করলে আধা ডজন পুলিশ, অমাবস্যায় তিনটে। একমাত্র বর্ষাকালেই আগেভাগে কিছু ঠিক করা যায় না। বিলেতে বারমাস তাই।

কিন্তু আমি চাঁদকে সত্যি চিনতে শিখলুম জাহাজে, মেব্‌লের সঙ্গে। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে চাঁদ কখন ওঠেন, কতখানি কাৎ হয়ে ওঠেন আর শুক্লা সপ্তমীতে চাঁদ কখন অস্ত যান, এদিকে কাৎ হয়ে না ওদিকে কাৎ হয়ে সে আমি ভালো করে জানলুম জাহাজে, ডেক চেয়ারে, মেব্‌লের গা ঘেঁষে। ক্লান্তিতে সে বেচারী চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ত, তবু কেবিনে ঘুমুতে যাবে না।

আমি ডেক চেয়ারে ঘুমুতে পারিনে। তাতে কিন্তু আমার কোনো ক্ষোভ ছিল না।

১৭ই আগস্ট

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রথম পরিচয় হয় পোর্ট সঈদে।

পোর্ট সঈদের সঙ্গে গোটা মিশরের অতি অল্পই যোগসূত্র। তাই পোর্ট সঈদ দেখে মিশর সম্বন্ধে রায় প্রকাশ ভুল। ও-শহরটা জন্মেছে এবং বেঁচে আছে জাহাজ-যাত্রীদের কল্যাণে। এবং জাহাজে যে রকম বহু যাত্রী কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হয়ে নব নব উল্লাস-উত্তেজনার সন্ধান করে, এখানেও ঠিক তাই। বরঞ্চ বলবো বেশি। বরঞ্চ বলবো, জাহাজে তুমি কি করলে না করলে তার সন্ধান তবু কেউ কেউ পেয়ে যেতে পারে, এখানে সে বালাই-ই নেই। এখানে তুমি ঘণ্টা পাঁচেক কি করে কাটালে, তার খবর জানবে কে? দেশভ্রমণ বড় ভালো জিনিস—তার 'একসস্ট্ পাইপ' দিয়ে মেলা পাপ বেরিয়ে যায়।

পোর্ট সঈদের পাপ লুকিয়ে রাখা যায় না। মেব্‌লের চোখে পর্যন্ত তার অভদ্র ইঙ্গিত খোঁচা মেরেছিল—যদিও আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, ও যেন সামান্য দু-একটা কেনা কাটা করে, আর গোটা দুই মসজিদ দেখেই জাহাজে ফেরে।

শেষটায় মেব্‌ল্‌কে বললুম, ও যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানকার লোক লক্ষ, ডিনার আরম্ভ করে তেতো জিনিস দিয়ে। প্রাচ্যের সঙ্গে মোলাকাত-দাওয়াতের আরম্ভেই পোর্ট সঈদের উচ্ছে-

ভাজা—যদিও অনেক বুড়বক্‌দের কাছে সেই বস্তুই ক্রিসমাসকেক্‌ লেডি ক্যানিং বলে মনে হয়।

পোর্ট সঈদ মিশরের প্রতীক নয়, বোম্বাইকে বরঞ্চ ভারতবর্ষের শহর বলা চলে। তাই যখন বোম্বাই দেখে মেব্‌ল্‌ খুশী হ'ল, তখন আমার ভয়-ভাবনা অনেকখানি কেটে গেল। যদিও সে বেচারী বোম্বাইয়ের রাস্তায় হাতী সাপ আর গৌরীশঙ্করের জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দেখতে না পেয়ে একটু মন-মরা হয়েছিল বৈকি?

বোম্বাইয়ে নেমেই ধরতে হ'ল কলকাতা মেল। সেখানে নেমে তড়িঘড়ি ফের শেয়ালদা—গোয়ালন্দ-চাঁদপুর হয়ে মধুগঞ্জ। মেব্‌ল্‌ অভিভূতের মত গাড়িতে জানলার কাছে বসে, গোয়ালন্দী জাহাজে ডেক-চেয়ারে খাড়া হয়ে দুচোখ দিয়ে বাইরের দৃশ্য যেন গিলছিল। তার কাছে সবই নূতন, সবই বিচিত্র। তার আনন্দে কিন্তু কাঁটা ফোটাতো তোমাদের দেশের দারিদ্র্য। স্টেশনে স্টেশনে ভিখিারি দেখে দেখে শেষটায় বেচারী অন্য দিকে মুখ ফেরাতো। বরঞ্চ আমি আয়ারল্যাণ্ডের ছেলে, ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমার দেশে কি হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুটা সচেতন, কিন্তু লণ্ডনের মেয়ে মেব্‌ল্‌ এসব জানবে কি করে? আবার সব দারিদ্র্যের জন্য কেবল ইংরেজই দায়ী, এই সহজ সমাধানই বা তাকে বলি কি প্রকারে? ভাবলুম, মেব্‌ল্‌ বোকা মেয়ে নয়, নিজের থেকেই আস্তে আস্তে সবকিছু বুঝে নেবে।

মধুগঞ্জ আর আমাদের বাঙলোটি দেখে মেব্‌ল্‌ মুগ্ধ—ঠিক একদিন আমি যেরকম মুগ্ধ হয়েছিলুম। আম, জাম, নিম, লিচু

গাছের কোনটাই সে কখনো দেখে নি। খানার টেবিলে যেসব ফল রাখা হ'ল, তারও সব কটাই তার অজানা। 'কারি' যে এক নয়, দশ-বিশ রকমের হয়, সেকথা মধুগঞ্জে এসে প্রথম শুনলো। এসব দেখে শুনে মেব্‌লের বিশ্বাস হ'ল, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডে ওয়াণ্ডার করবার মত কিছুই নেই।

এসব জিনিস তোমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলছি কেন সোম? একটু পরেই বুঝতে পারবে।

অ্যাক্‌স-আঁ-প্রভাঁস ছাড়ার পর মধুগঞ্জে এসেই আমাদের সত্যকার হনিমুন আরম্ভ হ'ল। হনিমুন! হায় ভগবান, না শয়তান—কাকে ডাকব?

এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে যে মর্মান্তিক সত্য আমার সর্বাঙ্গে চাবুক মেরে গেল, তার মূল ট্র্যাজেডি—আমি নিবীর্য—ইম্পটেণ্ট। মেব্‌ল্‌কে যৌনতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কথাটা কত সহজে বলা হয়ে গেল। এরকম সহজ কথা শোনা তোমার আমার দুজনেরই অভ্যাস—পুলিশের লোক হিসেবে। জজ কত সহজ সরল ভাষায় আসামীকে বলেন, 'তাই তোমার ফাঁসী।' কিন্তু সে কি তখন তার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে? পরেও কি পারে? এর অর্থ তাকে বুঝতে হয় প্রাণ দিয়ে এবং প্রাণ দেবার পর বোঝাবুঝির রইলই বা কি?

আমি ইম্পটেণ্ট। রায়টা কত সহজ। কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থ আমি এখনো বুঝি নি। দিনে দিনে পলে পলে পদাঘাত খেয়ে খেয়ে যেটুকু বুঝতে পেরেছি সে জিনিস আমি তোমাকে কিম্বা এ সংসারের অন্য কাউকে বোঝাবো কি করে? আমার

যেদিন ফাঁসী হবে সেদিন আমি বোঝাবুঝির বাইরে চলে যাব বটে, কিন্তু তোমরা হয়ত সেই দিনই খানিকটে বুঝতে পারবে।

পনেরো দিন পরে তাই আমি কলকাতা গিয়েছিলুম, ডাক্তারদের কাছে। তারা অনেক পরীক্ষা করে যা বললেন সেটাও অতি সহজ। নিজের থেকে যদি না সারে তবে ওষুধ-পত্রে কিছু হবে না। কলকাতার ডাক্তারদের হাইকোর্টে আমার মৃত্যুদণ্ড বাহাল রইল।

ফিরে এসে যখন শুনলুম তুমি রটিয়েছ আমি কলকাতা গিয়েছি সরকারী কাজে তখনই বুঝতে পারলুম, তোমার আনক্যানি ষষ্ঠবুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছ কিছু একটা হয়েছে এবং আর পাঁচজন যেন তার কোনো ইঙ্গিত না পায় তাই ও গুজবটা রটিয়েছ। থ্যাঙ্কস্।

এত সরল জিনিস, কিন্তু আমার কাছে এখনো এটা রহস্য।

অমি দেখতে ভালো, সৌন্দর্যবোধ আমার আছে, আমি প্রাণবান পুরুষ, আমার স্বাস্থ্য ভালো, আবার জোর দিয়ে বলছি, সোম, আমার মত স্বাস্থ্য পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে, আমার অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই, পাঁচজনের তুলনায় আমাকে বোকা বলা যেতে পারে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা মেব্‌লের মত সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়ারূপে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে—

এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের একি নিষ্ঠুর ঠাট্টা না শয়তানের অট্টহাসি! এই পার্ফেক্ট প্যাটার্নটির উপর

কে যেন ছড়িয়ে দিলে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। তোমাদের ভাষায় বলতে হলে, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরি করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিল গোরক্ত। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শূয়রের খুন!

কেন, কেন, কেন?

আমি কোনো উত্তর পাই নি।

অনেক ভেবেছি। অনেক ভেবেছি বললে অল্পই বলা হ'ল। আট বছর ধরে ঐ একটি কথাই ভেবেছি বললে ভুল বলা হবে না। কাজকর্মে লিপ্ত থাকার সময় আমার চেতন মন এ সমস্যা ভুলে যেত সত্য, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই মন আবার সেই প্রশ্নে ডুব মারত। এখনো মারে। আমার এ জীবন-চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মন ঐ কথাই ভাববে। আমি শেষ দিন পর্যন্ত ইডিয়ট ইস্কেসাইলের মত খাদ্য শুধু চিবিয়েই যাবো, কখনো গিলতে পারবো না। এই যে পাঁচ লক্ষ ক্যাণ্ডল্-লাইটের জোর সার্চ লাইট আমার চোখের উপর জ্বলছে সেটাকে কখনো সুইচ্-অফ্ করতে পারবো না।

নিরাশ হয়ে আমি এ ক'বৎসর ধরে বহু ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। সব ধর্মই দেখি সন্ধান করে একই বস্তু—তার নাম সেলভেশন, মোক্ষ, নির্বাণ, নজাত। কিন্তু আমি তো সেলভেশন চাইছিনে? আট বছরের বাচ্চা কি সুন্দরী কামনা করে?

তোমরা অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকই তাবৎ ধর্ম বানিয়েছ। আমরা পশ্চিমের লোক কি এক অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে তারই একটা

খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, সেলভেশন জিনিসটের প্রতি আমাদের ক্ষুধা নেই বলে আমরা ধর্মটা নিয়েও নিই নি। তা না হলে এদিকে বলছি, কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে, ওদিকে দেখো জর্মনদের মারার জন্য আমরা শত শত কৌশল বের করছি, লক্ষ লক্ষ লোক মারছি। শুধু কি তাই? 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে,' এ ধর্মে যে লোক বিশ্বাস করে না তাকে এটা গেলাবার জন্য কত শার্লমেন, কত পোপ কত লোককে মেরেছে! পাদ্রীটিলার বুড়ো জোন্‌কে বাদ দাও। বাদবাকি মিশনারিরা কি করছে? অসহায় নিরুপায় নিগ্রোদের জীবন অতিষ্ঠ করে তাদের ক্রীশ্চান বানাচ্ছে।

শুধু একটা ধর্মে আমি কিছুটা হদিস পেয়েছি। এবং আশ্চর্য সে ধর্মে আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস করে বড় জোর দশ লক্ষ লোক। পার্সীদের ধর্ম, জরথুস্ত্রী ধর্ম।

জরথুস্ত্র বলেন, সৃষ্টির প্রথম থেকেই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব। আলোর প্রতীক আহির মজদা—আমাদের ভাষায় ভগবান—আর অন্ধকারের প্রতীক আহির মন—আমাদের ভাষায় শয়তান। জরথুস্ত্রীদের মতে যারা আহুর মজদার পক্ষে তাদের বিশ্বাস, শেষপর্যন্ত এ যুদ্ধে জয়ী হবেন তিনিই। আহির মন আহুর মজদার সঙ্গে পেরে উঠবে না।

সংসারে যা কিছু সত্য শিব সুন্দর তা আহুর মজদার সৃষ্টি আর যত কিছু মিথ্যা, অমঙ্গল, কদর্য তা আহির মনের।

তবে কোন্ সুস্থ মানুষ এই শয়তানের পক্ষ নেবে?

সেই তো মজা, সোম, সেই তো মজা।

দেখোনি, এ সংসারে উন্নতির জন্য, স্বার্থের খাতিরে মানুষ কতখানি মিথ্যাচারী, ক্রূর, মিত্রঘ্ন হয়। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের বিশ্বাস এই ধরনের লোকই পৃথিবীতে বেশি। এরা মুখে ভগবান—আহুর মজদাকে—মানে, পূজো চড়ায়, শির্নী বিলোয়, গির্জাতে মা-মেরীর সামনে মোমবাতি জ্বালে, কিন্তু আসলে কি এরা আহ্রির মনকেই জীবনদেবতারূপে বরণ করে নেয় নি? আপন জানা-অজানায় এরা কি মেনে নেয় নি যে সুদূর ভবিষ্যতে যা হবার হবে, মজদা জিতুন আর মনই জিতুন, আমার এ জীবনকালে যখন দেখতে পাচ্ছি ক্রূর কঠিন মিথ্যাচারী না হয়ে আমি সাংসারিক উন্নতি করতে পারবো না তখন আর গত্যন্তর কি?

এদের সবাইকে আমি দোষ দি নে, সোম। কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে—যে তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—, প্রতিদিন মাথা হেঁট করে স্বীকার করা যে আমি জীবনযুদ্ধে হেরেই চলেছি—কে শুনতে চায় সত্যাবলম্বন ক'রে কিম্বা না ক'রে—এ কর্ম কি সহজ?

তবেই দেখো সোম, পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই এযাবৎ কার্যতঃ স্বীকার করে নিয়েছে যে, উপস্থিত আহ্রির মনই শক্তিশালী, তাকে না মেনে উপায় নেই। এমন কি তাদের একটা 'বনাফাইডি' 'ডিফেন্স্' পর্যন্ত রয়েছে। শেষ বিচারের দিন যখন আহুর মজদা এদের শুধাবেন, 'তোমরা আহ্রির মনের

পক্ষ নিয়েছিলে কেন ?' উত্তরে তারা ক্ষীণকণ্ঠে বলবে—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তখন তিনিই শক্তিবান—'তখন, হুজুর, তিনিই ছিলেন শক্তিশালী, তাঁকে না মেনে উপায় ছিল কি ?' এটা কি খুব সদুত্তর ? কেন, ভেবে দেখো, গ্রামের জুলুমবাজ জমিদারের ভয়ে যখন প্রজারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তখন তুমি কি সব সময় ধর্মের 'শোলোক্' কপচাও ?'

কিন্তু আমার জীবনে এ দর্শনের প্রয়োগ কোথায় ?

পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন শাস্ত্রেই আছে, অতি পূর্বযুগে নাকি একবার এক বিরাট বন্যা হয়েছিল ; প্রাচীন আসিরিয় বাবিলনীয় প্রস্তরগাত্রে সে ঘটনার কথা খোদাই করা আছে, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে, তোমাদের শাস্ত্রেও আছে কেশব তখন মীন শরীর ধরে বেদ বাঁচিয়েছিলেন, অর্থাৎ সে বন্যায় তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ভেসে যায় নি, কোনো এক মহাপুরুষ তার শ্রেষ্ঠতম জিনিস বাঁচাতে পেরেছিলেন।

এই বন্যা নিয়ে একটি আধা-খৃশ্চানী আধা-মুসলমানী গল্প আছে।

সেই বন্যা আসার পূর্বে জেহোভা তখনকার দিনের পয়গম্বর নূহকে ডেকে বললেন, বন্যায় সব ভেসে যাবে, তুমি একটা নৌকো বানিয়ে তাতে পৃথিবীর সব গাছ, ফুলের বীজ এবং যত প্রকারের প্রাণী এক এক জোড়া করে রেখো। বন্যার পর তাই দিয়ে পৃথিবী আবার আবাদ করবে। সাবধান, কিছু যেন খোয়া না যায়।

নূহ তাই করলেন, কিন্তু বন্যার পর দেখেন কি, ইঁদুরে তাঁর

আঙুরের বীজ খেয়ে ফেলেছে। আঙুর ফলের রাজা। গোঁজা-মিল দিয়ে সে ফলটা হারিয়ে যাওয়ার কেচ্ছা তিনি চাপা দিতে পারবেন না। ভারি বিপদে পড়লেন।

ওদিকে কিন্তু হুঁসিয়ার শয়তানও সব মাল এক এক প্রস্ত করে রেখেছিল। সে তখন নূহকে তার বাঁচানো আঙুরের বীজ দেবার প্রস্তাব করলে—তার বীজতো আর ইঁদুর শয়তানী করে খেতে পারে না—অবশ্য কুমৎলব নিয়ে। নূহের মনেও ধোঁকা ছিল কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়—বে-আঙ্গুর দুনিয়া নিয়ে তিনি আল্লাকে মুখ দেখাবেন কি করে?

পৃথিবীর জমিতে শয়তানের স্বত্ব নেই। তাই শর্ত হ'ল, নূহ দেবেন জমি, শয়তান দেবে আঙুরের বীজ। গাছের তদারকিও ৫০।৫০।

নূহ তো যত্ন করে সকাল সন্ধ্যা চারার গোড়ায় ঢালেন সুমিষ্ট, সুগন্ধি বসরাই গোলাপজল আর শয়তান ঢালে গোপনে গোপনে না-পাক শূয়রের রক্ত।

নূহের পাক পানির ফলে ফ'লে উঠল মিষ্টি আঙুর ফল। আঙুরের মত ফল পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু শয়তান যে দিয়েছিল না-পাক চীজ; তারই ফলে আঙুর পচিয়ে তৈরী হয় মদ। সেই মদ খেয়ে মানুষ করে মাতলামো, যত রকমের জঘন্য পাপ।

আহুর মজদা আমার জীবনের প্যাটার্ন গড়েছিলেন অতি যত্নে, ভালো কোনো রঙই তিনি সে প্যাটার্নে বাদ দেন নি, সে-কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি।

আহির মন আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। প্যাটার্ন যখন শেষ হবার উপক্রম তখন সে তার ভিতর ছেড়ে দিল মাত্র একটি পোকা। এক রাত্রেই প্যাটার্ন কুটি কুটি হয়ে গেল।

বিশ্বকর্মা তিন ভুবনের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে তিলে তিলে গড়লেন অনবদ্যা তিলোত্তমা। আহির মন তার রক্তে ঢেলে দিল গলিত কুষ্ঠের ব্যাধি।

এ প্যাটার্ন রিপু করা, এ গলিত কুষ্ঠকে নিরাময় করা আহুর মজদার মুরদের বাইরে।

১৮ই আগস্ট

যৌবনে বেঁচে থাকার আনন্দেই (জোয়া ছ ভিব্র্) মানুষ এত মত্ত থাকে যে মোক্ষের সন্ধান সে করে না। শেলি না কে যেন বলেছেন,

I have drunk deep of joy
And I will taste no other wine to-night.

যখন মানুষ সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা যখন বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পায় তখনই সে ও-সব জিনিস খোঁজে। এ-কথা শুধু ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়, গোটা জাতির পক্ষেও খাটে। তোমাদের জাতি যে কত পুরনো সেটা শুধু এই তত্ত্ব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তোমরা মোক্ষের অনুসন্ধান আরম্ভ করেছ খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচশ' কিম্বা হাজার বছর পূর্বে। মুসলমানরা করলো খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছ'শ বছর পরে।

তাই দেখো, এই মধুগঞ্জের মুসলমানই তোমাদের তুলনায় ফুর্তি-ফার্তি করে বেশি ; কামায় টাকাটা, খর্চা করে পাঁচ সিকে।

আইরিশমেনদের কাছেও মোক্ষ-সন্ধান এসেছে সম্প্রতি—তাও পাঁচ হাত হয়ে, ঘষা-মাজা খেয়ে। তাই আমার জীবনে না ছিল মোক্ষ-সন্ধানের জাতীয় ঐতিহ্য, না ছিল কণামাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজন। যে সব ধর্মের কথা এসে যাচ্ছে সে-গুলোর অনুসন্ধান আমি করেছি আহির মনের মার খেয়ে। এবং যে সব মীমাংসায় পৌঁচেছি (তার কটা সম্বন্ধেই বা আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ?—সম্পূর্ণ সত্য তো ভগবানের হাতে, মানুষের চেষ্টা তো ক্রমাগত যতদূর সম্ভব কাছে আসবার—) সেগুলো মাত্র কিছুদিন হ'ল।

তাই আমার এ 'জবান-বন্দিতে' আহুর মজদা আহির মনের কথা আসা ছিল উচিত হয়ত সর্বশেষে। কিন্তু তা-ই বা বলি কি করে ? আমরা ইতিহাস লিখি ক্রনোলজিকালি—কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছিল, কোন্‌টা পরে সেই অনুযায়ী। কিন্তু আভিধান লেখার সময় অ্যালফাবেটিকালি ; যে শব্দ পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমরা অভিধান লেখা আরম্ভ করিনে। আমার জীবন অভিধান তো নয়ই, ইতিহাসও নয়। আমি মরে যাওয়ার পর আমার জীবন তোমার কাছে ইতিহাসের রূপ নেবে। ইতিহাসের বর্তমান থাকে না, ভবিষ্যৎ নেই তার আছে শুধু ভূত। আমি বেঁচে আছি, কাজেই আমার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু সে থেকেও নেই আর ভূত আর বর্তমান এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট

ছাড়িয়ে পাকাপাকি কালানুক্রমিক-ভাবে সব কিছু বলতে পারবো না।

আহির মনকে স্বীকার করে আমি অধর্ম করেছি? অধর্ম অন্যায় যাই করে থাকিনে কেন, আমি কিন্তু ভণ্ডামি করি নি। সে-ই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। কিন্তু আবার দেখ, আরেক নূতন ডিলেমায় পড়ে গেলুম। আমি যদি ভণ্ডামি ঘৃণা করি তবে আমি আবার আহুর মজদাপন্থী হয়ে গেলুম! ভণ্ডামি তো আহির মনের, সত্যনিষ্ঠা মজদার। এ দ্বন্দ্বের কি অবসান নেই?

হয়তো আছে, হয়তো নেই। তাই হয়তো তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব মুলতুবী রেখে দেখতে হয় কর্মক্ষেত্রে মানুষ কি করে। সেখানে তো মানুষকে অহরহ ডিসিশন—মীমাংসা, নিষ্পত্তি—করতে হয়। এ সংসারে সকলের ভিতরেই কিছু না কিছু হেমলেট লুকিয়ে আছে যে সর্বক্ষণ 'টু বি অর নট টু বি'র সন্দেহ-সমুদ্রে দোদুল দোলায় দোলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডন্ কিক্সটও রয়েছে যে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে, নাঙা-তলোয়ার হাতে নিয়ে যাকে তাকে তাড়া লাগায়—আমরা যাকে বলি বার্কস আপ্ দি রঙ্ ট্রী—যে গাছে বেরাল ওঠে নি তারই তলায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে করতে থাকে ঘেউ ঘেউ।

বেচারী মেব্ল্। সে আমার ডন কিক্সট্ রূপটাই চিনতো। লণ্ডনে অ্যাক্স্-আঁ-প্রভাঁসে কিছু একটা ঘটলেই আমি তড়িঘড়ি অ্যাক্শন্ নিয়ে তার একটা সমাধান করে দিতুম। ভুল যে করি নি তা নয়। একটা ঘটনার কথা বলি। অ্যাকসের বনে

গিয়েছি মেব্‌ল্‌কে নিয়ে বেড়াতে। হঠাৎ শুনি নারীকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার। ছুটে গিয়ে দেখি এক ছোকরা একটা মেয়েকে জাবড়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করছে আর মেয়েটা—বাপ্‌রে বাপ্‌ সে কী তীক্ষ্ণকণ্ঠ—চেঁচাচ্ছে। আমি ডন কিক্‌সটের মত ছোঁড়াটার কলারে ধরে দিলুম হ্যাঁচকা টান, আর গালে গোটা দুই চড়! মেয়েটা আমার দিকে তাকালে। আমি ভাবলুম, সে বুঝি আমার শিভালরির কদর জানাতে গিয়ে আমাকেই না চুমো খেয়ে বসে! কি হ'ল, জানো, সোম? মেয়েটা দৃঢ়পদে এগিয়ে এল আমার কাছে। তারপর বলা-নেই কওয়া-নেই, দু'হাত দিয়ে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে মারলে আমার গালে—ছোঁড়াটার গালে নয় আমার গালে-গণ্ডা-পাঁচেক চড়! মোজা-বুনুনির স্পীডে। আমি তো বিলকুল্‌ বেকুব। তারপর মেয়েটা ছোঁড়াটার হাত ধরে হনহন করে চলে গেল বনের ভিতর।

মেব্‌ল্‌ শেষ অঙ্কটা দেখতে পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছিল।

কি করে জানবো, বলো, কোনটা প্রেমের ন্যাকরামোর চিৎকার আর কোনটা ধর্ষণভীতির সকরুণ আর্তরব! একেই বলে বার্কিঙ্‌ আপ দি রঙ্‌ ট্রী!

সেই আমি কলকাতার ডাক্তারদের শেষ রায় শুনে ফিরে এলুম মধুগঞ্জে। মেব্‌ল্‌কে আদর না করে ঝুপ করে বসে পড়লুম ডেকচেয়ারে ঘণ্টা তিনেকের তরে। ডন তখন হেমলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। মেব্‌ল্‌ তখন আমার কপালে হাত বুলিয়ে আদর করেছিল—আমি সাড়া দিই নি।

সব কথা মেব্‌ল্‌কে খুলে বলার প্রয়োজন হয় নি। কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর আমি তার গাত্র স্পর্শ করছিনে দেখেই সে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছিল। পরের দিন ভোর বেলা দেখি, মেব্‌ল্‌ ঘরে নেই। বারান্দায় পেলুম তাকে, একটা মোড়ার উপর হু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত করতে পারলুম না।

তোমাদের দেশে নাকি নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ আছে। যৌনক্ষুধাকে অবহেলা করে তোমাদের বহুলোক জীবনধারণ করে। আমাদের দেশে যে একদম নেই সেকথা আমি বলছিনে। ক্যাথলিক পাদ্রী আর মিস্তিকরা রমণী-সঙ্গ কামনা করে না, তোমাদের বিধবারা যেরকম যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সর্বপ্রকার প্রেমকেও কাঁটার মত দেহ-মন থেকে তুলে দূরে ফেলে দেন। তাঁদের শুধু লড়তে হয় শারীরিক প্রলোভনের সঙ্গে। আমার বেলা তো তা নয়, আমি ভালো-বাসতে পারি, বাসিও, কিন্তু শরীর দিয়ে বাসতে পারবো না। সেও হয়ত অসম্ভব কঠিন মনে হত না যদি মেব্‌ল্‌ আর আমি একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে নিতুম, আমরা আমাদের প্রেম দেহের স্তরে নিয়ে যাবো না।

তোমার মনে আছে, সোম, তোমার আমার সামনে আমাদের জেলের একটা ঘটনা? স্বদেশী কয়েদীকে শেষ বিদায় দিতে এসেছে তার স্ত্রী, বাচ্চাকে কোলে করে। বাপ চেয়েছিল ছেলেকে কোলে নিতে, বাচ্চাটাও মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছিল বাপের দিকে। মাঝখানে লোহার জাল।

আমরা দুজনাই সে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছিলুম। অবান্তর তবু যখন সুবাদটা এল তাই বলি, পরে আমার কাছে খবর এল, তুমি নাকি গোপনে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে। খবরটা আমাদের দিয়েছিল জেলার, আরো গোপনে—তোমার বিরুদ্ধে আমাকে তাতানোর জন্য। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ব্যাটাকে ধরে হাণ্টার নিয়ে তার ন্যাংটো পাছায় আচ্ছা করে চাবকাই। ভাষাটা একটু অভদ্র হ'ল, না সোম? কিন্তু আমি তখন খুনিয়া রাগের মাথায় যে অভদ্র ভাষা মনে মনে ব্যবহার করেছিলুম, তারই হুবহু প্রকাশ দিলুম মাত্র। আহির মনকে মেনে নিয়েও ভণ্ডামি মেনে নিতে পারি নি সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সে কথা থাক্।

আমার অবস্থা তখন আরো কঠোর। আমার আর মেব্লের মাঝখানে যে জাল রয়েছে সেটা একদিন ছিন্ন হয়ে গেলে যেতেও পারে—কলকাতার ডাক্তাররা সেই অতি ক্ষীণ আশাই দিয়েছিল—এবং প্রতিদিন প্রতি রাত্রি সেই আশাই আমাকে মুখ ভেঙচিয়েছে।

নিষ্কাম প্রেমের কথায় ফিরে যাই। কাব্য যদি মানব-জীবনের দর্পণ হয় তবে শুধাই তোমাদের সে দর্পণে নিষ্কাম প্রেমের কতটুকু আভাস মেলে? রায় বাহাদুর কাশীশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন দু'খানি সংস্কৃত কাব্যের ইংরিজি অনুবাদ। মেঘদূত আর গীতগোবিন্দ। (পর্নোগ্রাফি আর রিয়েল আর্টের মধ্যে তফাৎ কি তাই নিয়ে তখন একটা মোকদ্দমা চলছিল; রায়-বাহাদুরের মতে মেঘদূত-গীতগোবিন্দ আর্ট আর মিস্ট্রিজ অব

দি কোর্ট অব লণ্ডন অশ্লীল, যদিও তাতে শরীরের খুঁটিনাটি বর্ণন অনেক, অনেক কম)। এ বই দু'খানিতে কি নিষ্কাম প্রেমের ছড়াছড়ি? অন্য বইয়ে থাকতে পারে এই ভেবে আমি রায় বাহাদুরের দ্বারস্থ হই। তিনি কবুল জবাব দিয়ে বললেন, 'সংস্কৃতে নিষ্কাম প্রেমের বালাই নেই, সে বস্তু এসেছে মুসলমান আগমনের পর বাঙলা-হিন্দীতে। খুব সম্ভব সূফীদের নিষ্কাম প্রেম থেকে এ বস্তু এ-দেশে পাচার হয়েছে।' আমি তা হলে বলবো, তোমরা যতদিন ভিরাইল, বীর্যবান ছিলে ততদিন নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে ছিলে সম্পূর্ণ অচেতন। নিষ্কাম প্রেম অনৈসর্গিক। কিন্তু থাক তোমাদের হিন্দুশাস্ত্র। আমি ক্রীশ্চানের ছেলে। আমি বরঞ্চ বাইবেলে যাই।

আমি বিলক্ষণ জানি বুড়ো পাদ্রী তোমাকে অনেক বাইবেল উপহার দিয়েছেন, বহুবার তোমাকে বইখানা পড়বার জন্য অনুরোধ করেছেন কিন্তু তুমি পড়ো নি। কাজেই যে ক'টি লাইন তোমাকে শোনাবো সেগুলো তুমি আগে কখনো শোনো নি।

"How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter !! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of cunning workman.

Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor : thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.

Thy two breasts are like two young roes that are twins.

Thy neck is a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.

Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries.

How fair and how pleasant art thou, O love for delights!

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples;

And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

I am beloved's, and his desire is toward me."

কী গম্ভীর, হাউ সাবলাইম! পাশবিক যৌনক্ষুধাকে সৃষ্টির কী মহিমময় অনিন্দ্যসুন্দর নন্দনকাননে তুলে নিয়ে গেল তার স্বর্ণপক্ষ দিয়ে এ কবিতা! এ যৌনক্ষুধা নন্দনের সুধায় সিঞ্চিত না থাকলে এর বর্ষণে ইন্দ্রপুরীর হাসি মুখে মেখে নিয়ে দেবশিশুরা মর্তে অবতীর্ণ হত কি করে?

বিরাট বাইবেলে এই একটিমাত্র প্রেমের কবিতা ছিট্‌কে এসে পড়েছে। কি করে পড়ল তার সদুত্তর কোনো পণ্ডিত এখনো দিতে পারেন নি। তাই বোধ করি তাঁরা ধমক দিয়ে বলেন, এ-প্রেম রূপকরূপে নিতে হবে, এ প্রেমের সঙ্গে মানব-মানবীর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই—এ প্রেম নাকি 'দি মিউচেল লাভ অব ক্রাইস্‌ট্‌ অ্যাণ্ড হিজ চার্চ' বর্ণনা করেছে। চার্চের বড় কর্তা স্বয়ং পোপ। এখানে আমি পোপের স্বার্থান্বেষী করাঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখতে পাই।

তোমাদের আদিরসাত্মক কামরসে-ঠাসা বৈষ্ণব কবিতাও নাকি শুধু বৈকুণ্ঠের দেবদেবীর জন্য। সেগুলোকেও নাকি প্রতীক হিসেবে নিতে হয়। এখানে কার স্বার্থ লুকানো আছে জানিনে।

আমি মানিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব কবিতা শব্দার্থে নিতে হবে। যৌন সম্পর্ক জীবনের অন্যতম গভীর সত্য। তাকে স্বীকার করে আমাদের কবিরা সত্যকে স্বীকার করেছেন মাত্র। এতে কোনো দুঃসাহস বা মূঢ়তার প্রশ্ন ওঠে না। তোমাদের কোনো কোনো মন্দিরে যৌন সম্পর্কের নগ্ন প্রস্তর-মূর্তি দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়। আমি হইনে। কাব্যে যে

সত্য কবিরা অকুণ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন,. শিল্পী প্রস্তর-গাত্রে সেটা খোদাই করবে না কেন?

তুমি বলবে, এসব গুরুগম্ভীর তত্ত্বের টীকা-টিপ্পনি কাটার কি অধিকার আমার? অধিকার তবে কার? পুরুত-পাণ্ডাদের, পাদ্রী-গোঁসাইদের? কিন্তু ভগবান তো তাঁদের পকেটের ভিতর। এ-সব তত্ত্বে তাঁদের কি প্রয়োজন? গীতগোবিন্দ বাইবেল এগুলো তো আমার মত পাপীতাপীদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। যে ভক্ত ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন তিনি মন্দিরে যাবেন কি করতে? মন্দিরে তো যাব আমি। এসবের মূল্য যাচাই করবো আমি, অর্থ বের করবো আমি।

জীবনের এই গভীরতম রহস্যাবৃত সত্যের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি বলেই কি আহির মন আমাকে এর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করলো?

২০শে আগস্ট

পলে পলে তিলে তিলে কত যুগ ধরে আমি কি দহনে দগ্ধ হয়েছি, সে শুধু আমিই জানি। এ দহন কিন্তু সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তোমাদের সাধকেরা বলেন, বেদনা আসে মনের বট্‌ল্‌নেকের ভিতর দিয়ে, সেই মনকে তুমি যদি আয়ত্তে আনতে পারো তবে আর কোনো বেদনা-বোধ থাকবে না। এ তত্ত্বটা আমি যাচাই করে দেখি নি, কারণ আমার মনে হয়েছে মনের বট্‌ল্‌নেক যদি আমি বন্ধ করে দিয়ে বেদনা-বোধকে থামিয়ে দি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবোধের অনুভূতিও আমার চৈতন্যে প্রবেশ করতে

পারবে না। তার অর্থ, সর্বপ্রকার অনুভূতি বিবর্জিত হয়ে জড়জগতে ইঁট-পাথরের মত শুদ্ধমাত্র খানিকটে স্পেস নিয়ে এগসিস্ট করা। তাহলে আত্মহত্যা করলেই হয়। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলে গিয়ে যে যার পরিমিত জায়গা দখল করে অস্তিত্ব বজায় রাখবে। তফাৎ কোথায়?

আমাদের গুণীরা বলেন, হৃদয়-বেদনা ভুলতে হলে কাজের মধ্যে ঝাঁপ দাও। মন তখন কাজে এমনি নিমগ্ন হয়ে যাবে যে, অন্য কিছু ভাবতে পারবে না। আমি তাই সেই সময়ে কাজে দিলুম ঝাঁপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি হঠাৎ কি রকম আমার এলাকার খুন-খারাবীর আদমশুমারী নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, এলাকার বিরাট ম্যাপ তৈরি করে বদমায়েশীর জায়গাগুলোতে চক্কর কেটে কেটে তার কেন্দ্রস্থলের বদমায়েশকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম; দাগী আসামী জেল থেকে খালাস পেলেই তার গ্রামকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের গ্রামের চুরি-চামারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া থেকে তোমাদের কাছে সপ্রমাণ করলুম, ঘড়েল বদমাইশ আপন গাঁয়ে বদ-কাজ করে না।

তাতে করে শুধু তোমাদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল। আমার কোনো লাভ হয় নি।

কাজের ভিতর সমস্তদিন তুমি যে বেদনা-বোধকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে ভাবলে বেঁচে গেছো, সে তখন কাজের অবসানে তোমার সকল বাঁধ ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয় তোমার সর্ব অস্তিত্বকে। পলে পলে তিলে তিলে দিনভর তুমি যদি তোমার বেদনা-বোধকে নিয়ে পড়ে থাকো, তাকে যদি কাজ কিম্বা অন্য

কোনো কৃত্রিম উপায়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না করো, তবে তার ইনটেনসিটি অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু সলমনের বোতলে ভরা জিন্ যখন সন্ধ্যায় নিষ্কৃতি পায়, তখন তার বেধড়ক মার থেকে আর কোনো নিষ্কৃতি নেই।

সেই মার খেয়ে খেয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে করে—যেন এ-গালে চড় খেয়ে ও-পাশ হয়ে শুই, যেন ও-গালে চড় খেয়ে এ-পাশ হয়ে শুই—রাত বারোটায় এল ঘুম। কিন্তু শয়তান তোমায় নিষ্কৃতি দেবে কেন? ঘুম ভেঙে যাবে রাত দুটোয়।

পাশের খাটে মেব্‌ল্ শুয়ে। তার সোনালী ঢেউ-খেলানো এলো চুল চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে বালিশের উপর এঁকেছে বিচিত্র নক্সা। তার কপালে ঘামের একটু একটু ভেজার আভাস, চাঁদের আলো তারই উপর সামান্য চিক্ চিক্ করছে, বিলের 'ভেট' ফুলের পাপড়ির উপর এই আলোই আমি অনেকবার দেখেছি, ভাওয়ালির জানালা দিয়ে। মেব্‌লের হাত দু'খানি তার শরীরের দু'দিকে আলসে লম্বমান হয়ে অর্ধমুষ্টিবদ্ধ যেন দুটি 'ভেট' ফুলের কুঁড়ি। আর তার সমস্ত কিশোর তনু যেন গাদা করে রাখা শিউলি ফুলের পাপড়ি—হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল শিউলি ছিল মেব্‌লের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

এই গরমের দেশে শীতের দেশের মেয়েকে চাঁদের আলোতে কি রকম অদ্ভুত, রহস্যময় দেখাতো। আজ যদি হঠাৎ দেখি, আমার লিচুবনের ঘন সবুজের উপর গাদা গাদা সাদা বরফ জমেছে, তাহলে যে রকম সমস্ত বাগানখানা এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে ভরে উঠবে।

মেব্‌লের এই নিশিকান্ত সৌন্দর্য আমার আত্মার ক্ষুধাকে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে কত শতবার ভরে দিয়েছে। আস্বচ্ছ ফিকে বেগনি রঙের মসলিন নাইট-ড্রেসে জড়ানো মেব্‌লের শরীর আমার কবি-মানসের শুষ্ক মৃৎপাত্রকে অমৃত রসে বার বার ভরে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে দিত আমার সর্ব-ধমনীতে এক অদম্য যৌনক্ষুধা।

মনে আছে, সোম, তুমি আর আমি একদিন মফস্বলের এক গ্রামে নিষ্ক্রিয় ক্রোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সমস্ত গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—জল ছিল না বলে আমরা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ছটফট করেছিলুম।

সে আগুন তবু ভালো। নিরন্ন বিধবার শেষ কাঁথাখানা পুড়িয়ে দিয়ে সে আগুন তবু তো তৃপ্ত হ'ল।

আমার এ বহ্নিজ্বালার শেষ নেই। পিরামিডের উপরে দাঁড়িয়ে আমি একদিন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সাহারার মরুভূমির দূর-দিগন্তের শুষ্ক তৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলুম, আর তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে ভগবানের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আহির মন আমার সর্বশরীরের সেই সাহারার জ্বালা জ্বালিয়ে দিল।

শরীরে এ জ্বালা নিয়ে মানুষ সমাজে মিশতে পারে না। আমি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে কমিয়ে শেষটায় একেবারে আলেকজেণ্ডার সালকার্ক হয়ে গেলুম। বিষ্ণুছড়া আর মাদামপুরের মেমেদের ফোঁসফোঁসানি আর ছোবলাছুবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার

কোনো কষ্ট হয়নি; কিন্তু পাদ্রী টিলার মেয়েদের কলকল উচ্চহাস্য, তাদের লাজুক নয়নে আধা-প্রেমের ক্ষীণ আভাস আমার জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে তাকে করে দিল আরো ফাঁকা। কে যেন বলেছে, 'দি মোর লাইফ্ বিকামস্ এম্‌পটি দি হেভিয়ার ইট্ বিকাম্‌স টু কেরি ইট'। জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়, তাকে বহন করা হয়ে যায় ততই শক্ত। বড় খাঁটি কথা বলেছে। তবু আমি জীবনের সেই শূন্য ধামা বইতে পারতুম, কিন্তু সে ধামার সর্বাঙ্গে ছিল বিছুটি।

খুব সম্ভব আমারই দেখাদেখি মেব্‌ল্‌ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কি ভেবে বন্ধ করলো জানিনে। তার মনের কথা কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে যাব না। তার প্রতি আমি অবিচার করেছি কি না, তার বিচার একদিন হয়তো হবে, কিন্তু তার মনের কথা বলতে গিয়ে আমি যদি উনিশ-বিশ করে ফেলি তবে সে অবিচার আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

আমার ভিতরকার ডন কিক্‌সট্ ক্রমে ক্রমে কাতর হতে হতে রোগশয্যায় পড়ল। আর আমি, ও-রেলি, আস্তে আস্তে হেমলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলুম। বরঞ্চ হেমলেট বক্তৃতা ঝাড়তো প্রচুর—সামান্যতম প্রভোকেশনে সে বর্‌বর্ করে নানা-প্রকারের দার্শনিক রায় জাহির করতো এন্তার—তোমাদের যাত্রাগানে যে রকম ক্ষীণতম প্রভোকেশনে নায়ক-নায়িকা দূরে থাক, পাইক-বরকান্দাজ পর্যন্ত লম্বা লম্বা গান গাইতে আরম্ভ করে। আমার মুখের কথাও শুকিয়ে গেল।

বেচারী মেব্‌ল্। গোড়ার দিকে সে আস-কথা পাশ-কথা

বলে বলে আমাকে আমার কচ্ছপের খোলের ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিল; শেষটায় সে-চেষ্টাও ছেড়ে দিলে।

তখন আমি খেতে আরম্ভ করলুম মদ। মাস তিনেক দিন-রাত্তির আমি ভাম হয়ে পড়ে থাকতুম। বাটলার জয়সূর্য, যে কিনা ধান্যেশ্বরী মালের পাঁট জলের মত ঢক ঢক করে গিলতে পারে, সে পর্যন্ত আমার পানের বহর দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কখনো বলে হুইস্কি ফুরিয়ে গিয়েছে, কখনো বলে সোডা নেই। তারপর একদিন মাতাল হয়ে তার গালে মারলুম ঠাস ঠাস করে চড়। সম্বিতে ফিরে বড় লজ্জা পেয়েছিলুম, সোম। আমি কি অশিক্ষিত 'বক্সওয়ালা' যে আমি এরকম অন্যায় আচরণ করব?

মদ খেয়ে লাভ হয় নি। মদ খেলে মানুষের যৌন-ক্ষুধা উগ্রতর হয়, তৃপ্তির ক্ষমতা কমে যায়। আমার অতৃপ্তির আক্ষোভ তাই মদ খেয়ে কখনো কখনো বিকট রূপ ধরেছিল। তার কথা বলতে আমার ঘেন্না ধরে।

কিন্তু আসল কথাটা আমি শুধু এড়িয়েই যাচ্ছি। আমি শুধু বোঝাতে চাই, আমি কী কঠোর যন্ত্রণার ভিতর আমার জীবনটা কাটালুম, আর সেইটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিনে। কিন্তু এ দুর্দৈবে আমি একা নই। তোমার মনে আছে—চৌধুরীর কেসটা? ভদ্রলোক কী শান্ত, দয়ালু প্রকৃতির, গরীবদুঃখীদের ভিতর তাঁর দান-খয়রাতের কথা কে না জানে? আর কী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দেখে মনে হত

অনন্তযৌবনা—তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। তাঁর ঘাড়টির কথা তোমার মনে পড়ে কি? রাজরাণীর গর্ব নিয়ে যেন সে ঘাড় তাঁর মাথাটি তুলে ধরত। একদিন তাঁর সে ঘাড় নিচু হয়েছিল—আমি অবশ্য স্বচক্ষে দেখি নি। তাঁর স্বামী যেদিন হোমোসেক্-স্যুয়েল কেসে ধরা পড়লেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি এ রকম সাধুলোক কি করে এ রকম নোংরামি করতে পারে। তিনি নিজে আমার খাস-কামরায় স্বীকার করেছিলেন বলেই শেষটায় আমার প্রত্যয় হ'ল।

কী বিড়ম্বিত জীবন! ভগবান ভদ্রলোককে স্বাভাবিক যৌন-ক্ষুধা দেন নি। তাঁর অনৈসর্গিক যৌন-ক্ষুধাকে তিনি অদ্ভুত বিক্রমে কত বৎসর চেপে রেখে রেখে হঠাৎ একদিন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কুকর্মটা করে ফেললেন—শুনেছি তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দৈবাৎ কখনো এ রকম ধারা হয়েছে। সে ঘটনা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখে যে আত্মাবমাননার প্রকাশ দেখেছিলুম, তার দাগ আমার মন থেকে কখনো উঠবে না। ভদ্রলোক শেষটায় বলেছিলেন, 'আমাকে এখন সমাজ ঘেন্না করবে, কুষ্ঠরোগীকে মানুষ যে রকম বর্জন করে চলে। আমি সমাজের জন্য কি করেছি, সেকথা সমাজ স্মরণ করবে না—আমি তাকে দোষও দি'নে—কিন্তু আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রী, যিনি ভাবতেন আমি ধ্যান-ধারণায় আত্মসমর্পণ করেছি বলে তাঁকে অবহেলা করি, যাঁর পুত্রোৎপাদন-ঈপ্সাকে পর্যন্ত আমি সম্মান দিইনি, তিনি কি ভাববেন?'

ওঃ! এ কেসটা ধামা-চাপা দিতে তোমাকে কী বেগই না পেতে হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাশীশ্বর যদি অযাচিতভাবে গুহ্য সন্ধিসূড়ক আমাদের না বাৎলে দিতেন, তবে আমরা চৌধুরীকে বাঁচাতে পারতুম না। কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি নেই, হিন্দু সমাজের বিরাট পাণ্ডা রায়বাহাদুর কি করে এতখানি দরাজ-দিল হলেন! তবে হ্যাঁ শুনেছি, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর ভিতরও এরকম কিছু একটা হলে অন্য সন্ন্যাসীরা তাকে খুন করে না। হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তোমাদের ধর্ম সত্যই বড় অদ্ভুত! কত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে তোমাদের সাধুরা কত সত্য আবিষ্কার করেছে, আর তার থেকে পেয়েছে অন্তহীন সহিষ্ণুতা।

তুমি হয়তো জানো না, চৌধুরী আমাকে এখনো দক্ষিণের এক আশ্রম থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। শুনে খুশী হবে তার স্ত্রী তার সঙ্গেই আছেন।

দু বৎসর কঠোর সংযমে নিজকে মেব্‌লের কাছ থেকে দূরে রেখে এক গভীর রাত্রে নিজকে সামলাতে না পেরে আমি তার কাছে যাই। কি হয়েছিল, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো না।

সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্‌ল্‌ জয়সূর্যের ঘরে যায়।

সেই ভোরেই সে আমার পায়ের উপর তার মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। তার চুল ভিজে গিয়েছিল, আমার পা ভিজে গিয়েছিল। আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরয় নি।

থাক্।

২২শে আগস্ট

মেব্‌ল্‌ যদি মরে যেত, তবে কি আমার এর চেয়ে বেশি কষ্ট হত? বলতে পারবো না।

হঠাৎ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতুম, তাহলে কি বেশি কষ্ট পেতুম? বলতে পারবো না। তখনো বলতে পারি নি, আজও পারব না।

আমি বিমূঢ়ের মত বসে কয়েক দিন কাটাই।

আমার মনে হয় বড় শোক যখন আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রথম ধাক্কাতেই তার বেদনা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। আস্তে আস্তে যেমন যেমন দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহায় হরিণ-শিশুর শরীরকে ঘিরে যেন পাইথনের পাশ একটার পর একটা করে বাড়তে থাকে। শুনেছি, সে নাকি তখন আর আর্তস্বরে চিৎকার পর্যন্ত করে না। শেষ পাশ দেওয়ার পর পাইথন লাগায় আস্তে আস্তে চাপ। আমি কখনো দেখি নি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হরিণ কি আমার চেয়ে বেশি কষ্ট পায়?

ফাঁসির আসামীও ঘুমোয়। ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই নাকি তার মনে পড়ে অমুক দিন তার ফাঁসি। নিদ্রার কোল থেকে প্রাণ-রস যুগিয়ে নিয়ে মানব-শিশু যখন জাগলে, তখনই তার স্মরণে এল, সেই প্রাণটি তার অমুক দিন যাবে। পড়েছি, কোমর অবধি পুঁতে মানুষকে যখন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বধ করা হয়, তখন প্রথম কয়েকটা পাথরের ঘা খেয়েই সে নাকি অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চতুর্দিকের নরদানবরা তখন নাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জল দিয়ে তাকে চৈতন্যে নিয়ে

আসে। সম্বিতে ফিরে এসে সে নাকি প্রথমটায় বুঝতে পারে না, সে কোথায়—ট্রেনে ঘুম ভাঙলে আমরা যে রকম প্রথমটায় বুঝতে পারিনে, আমরা কোথায়। তারপর আবার ছুসরা কিস্তির প্রথম পাথরের ঘা খেয়েই নাকি সে সেই নির্মম সত্য বুঝতে পারে, তাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। বর্ণনায় পড়েছি, তাকে নাকি অন্তত বারপাঁচেক এক রকম সম্বিতে ফিরিয়ে এনে এনে মারা হয়।

শুনেছি, যে লোক যতটা খুন করে, চীন দেশে নাকি তার ততবার ফাঁসি হয়। কিন্তু ফাঁসি একবারের বেশি হতে পারে কি করে? তোমরা এই নিয়ে একটা ঠাট্টা করো না, অমুক লোকটার তিন মাসের ফাঁসি? কিন্তু তা-ও হয়। বিদগ্ধ চীনেরা তারও একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে। আসামীর গলায় ফাঁস দিয়ে আস্তে আস্তে তার দম বন্ধ করে আনতে আনতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। অজ্ঞান হওয়া মাত্রই ফাঁস ঢিলে করে দিয়ে জল ঢেলে, হাওয়া করে তাকে ফের সম্বিতে আনা হয়। যে য'বার খুন করেছে, তার উপর এই প্রক্রিয়া ততবার চলে। প্রতিবার সম্বিতে আসামাত্র তার কি মনে হয় ভেবে দেখো।

ধন্য সেসব লেখক, যাঁরা এসব মর্মান্তিক ব্যাপার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয়, হয় তাঁরা স্যাডিস্ট, নয় তাঁরা আপন জীবনে, আমরাই মত কোন এক কিংবা একাধিক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন।

এখনো বলছি, শারীরিক ফাঁসির সংখ্যার একটা সীমানা

আছে। পাঁচ সাত বার করার পর আসামী নিশ্চয়ই আর সম্বিতে ফিরে আসে না—অচৈতন্য অবস্থা থেকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ডুবে যায়। কিন্তু মনের ফাঁসি, আত্মার ফাঁসির সীমা-সংখ্যা নেই। বাইরে প্রকৃতিতে যে রকম রেণুতে রেণুতে প্রতিক্ষণ কোটি কোটি নবজন্মের সৃষ্টি, একই মানুষ সেই রকম ভিতরে ভিতরে মরে কোটি কোটি বার। এবং প্রতি দুই মৃত্যুর ভিতর যে সম্বিত, তখন সে সম্বিত শুধু তাকে জানিয়ে দেবার জন্য, এই শেষ নয়, এই মৃত্যুযন্ত্রণাই শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা নয়, আরো অনেকগুলো সম্মুখে রয়েছে।

এ সব অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে তারই একটা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে দিতে পারি যেখানে তুমি এসব অভিজ্ঞতার ক্ষীণতর রূপ খানিকটে যাচাই করে নিতে পারবে।

কোনো কোনো রুগীকে সারাবার জন্য তিন তিন বার অজ্ঞান করে অপারেশন করতে হয়। প্রথমবারে সে অতটা ডরায় না, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় বারের মধ্যে কয়েকদিন, এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ তার কি করে কেটেছিল, সে কথা তুমি তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে অনায়াসেই জেনে যাবে। তিন বারের পরও যদি সে না সারে, তখন, জানো সোম, সে আর দ্বিতীয় কিস্তিতে চতুর্থবারের মত অপারেশন করাতে সম্মত হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে, এদিক ওদিক লুটতে লুটতে খাট থেকে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণা এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করবে বলে আকুতি-মিনতি করে বিষের জন্য, কিন্তু

তবু আবার অপারেশন করাতে রাজী হয় না। তার সর্বক্ষণ মনে পড়ে, প্রথম অপারেশনের ক্লোরোফর্মের জড় নেশা কেটে যাওয়ার পর সে কী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিল, চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, গোঙরাতে গোঙরাতে মুখ দিয়ে শুধু ফেনা বের করেছিল।

সোম, আমার কিন্তু নিষ্কৃতি ছিল না। চিন্ময় বেদনার জগতে কোনো সরকারী আইন নেই, ডাক্তারী কোড্ নেই যে রোগীর বিনা অনুমতিতে তার অপারেশন করতে পারবে না। আমার মুখের প্রথম অপারেশনের ফেনা শুকতে না শুকতেই আমাকে সেই দুশমনের মত যমদূতদর্শন ডোমেরা টেনে নিয়ে যেত অপারেশন ঘরের দিকে। সেখানে আমাকে অপারেশন করা হত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্ধতিতে—যখন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয়নি। তারা আমাকে দু'পায়ে তুলে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ভিরমি খাইয়ে, কিম্বা তাতেও না হলে মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে অপারেশনের জন্য তৈরি করতো। ছুরির ঘা ক্লোরোফর্মের নেশাকে কাটতে পারে না বলে আজকের দিনে অপারেশন চলে রোগীকে যন্ত্রণা না দিয়ে। আমার বেলা কিন্তু ছুরির ঘা আমাকে সম্বিতে ফিরে নিয়ে আসত আর আমি সজ্ঞানে দেখতুম, আমার উপর ছুরি চলছে। পাছে আমার বিকৃত চিৎকারে সার্জেনদের অপারেশন করাতে বাধা জন্মায় তাই ডোমরা আমার মুখ চেপে ধরে রাখতো। গুঙরে গুঙরে শরীর যে তার টর্‌চার্ থেকে খানিকটে—সে কত অল্প—নিষ্কৃতি পাবে তার সর্ব পন্থা বন্ধ।

চোখের সামনে মেব্‌লকে দেখতে হত প্রতিদিন।

কেন আমি তাকে খুন করলুম না প্রথম দিনই ?

কিন্তু তার দোষ কি ? সে তো আর আমাকে ত্যাগ করে ঐ বাটলারটাকে গ্রহণ করে নি। বদ্ধ পাগলও আমাদের দুজনকে একাসনে বসিয়ে বিচার করবে না। আমার মনে হয় বহু বাজারের মেয়েও তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি ?

ঐখানেই তো ভুল। জয়সূর্যের থাকবার মত কিচ্ছুই নেই, সত্য, কিন্তু তার একটা সম্পদ আছে যেটা আমার নেই। সে সম্পদ কুকুর বেরালেরও থাকে, সে কথা বলে লাভ কি ? সে মানুষ দু'মিনিট বাদে মরবে তাকে কি এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, তুমি মরে যাবার পরও অনেক কুকুর বেরালও বেঁচে থাকবে, তাই বলে কি তাদের বাঁচাটা তোমার মরার চেয়ে বড় ?

মেব্‌ল্‌ তো নিয়েছিল মাত্র এইটুকুই। তাকে ও জিনিস যে কোনো পুরুষই দিতে পারতো। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে রকম নর্দমা থেকে খুঁটে তুলে তুলে ভাত খায়। তাকে কি আমরা দোষ দিই ?

গোড়ার দিকে আচ্ছন্নের মত বসে বসে এই সব চিন্তা করেছিলুম কিন্তু তখন সব ছিল ছেঁড়াছোঁড়া ! কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে যে তার চরম ফৈসালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করবো সে শক্তি আমার ছিল না। ফড়িঙের মত আমার মন এ-ঘাস থেকে ও-ঘাসে ক্ষণে ক্ষণে লাফ দিত, কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতো না।

আজও যে পারি তা নয়। তবে কয়েক মাসের জন্য একবার পেরেছিলুম, এমন কি সেই অনুযায়ী কাজও করেছিলুম, এবং সেইটে বলবার জন্যই তো এই চিঠি লেখা। সে কথা পরে হবে।

সব জেনে বুঝেও আমার মন অহরহ এক অন্ধ আক্রোশে ভরে থাকতো।

তুমি তো জানো আমাদের সিভিল সার্জন আর্মস্ট্রঙের মেম তার ছোকরা আরদালিটাকে মোটর-সাইক্ল কিনে দিয়েছিল। এ শহরে কে না জানতো তার রসময় কারণ। ওদিকে আর্মস্ট্রঙ তো আমার মত মন্দভাগ্য ছিল না? মেম যখন ভারতীয় তাগড়া ছোকরার বাদামী রঙ, কালো চুল আর প্রাচ্যদেশীয় বর্বর চোখের (মাফ করো সোম, আমি তোমাকে অপমান করছিনে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার দেশে খানদানীরা যে রকম আমাদের তুলনায় ঢের বেশী মার্জিত, ঠিক তেমনি তোমাদের চাষা-ভূষোরা আমাদের মজুরদের চেয়ে অনেক বেশী প্রিমিটিভ, অনেক বেশী সেক্সি) প্রাণ-মাতানো নেশায় মজে গেল, তখন গোড়ার দিকে আর্মস্ট্রঙ বেশ কিছুটা চোটপাট করেছিল। এমন কি, আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করলে আরদালিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারতো—মেম আর কি করতে পারতো—কিন্তু সে করে নি। আমার মনে হয়, প্রাণবন্ত স্বাভাবিক যৌনশক্তিশালী পুরুষ এসব ব্যাপারে অনেকখানি ক্ষমাশীল হয়, 'টু হেল্, চুলোয় যাকগে', বলে সে শান্তমনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। ঠিক কথা, কারণ আর্মস্ট্রঙ গিয়েছিল তেরিয়া হয়ে, উইথ ভেন্‌জেন্‌স। ঐ যে, কি সে বক্সওলাটার নাম, যে তার টিলায়

কুলী মেয়েদের হারেম পুষতো? আর্মস্ট্রঙও তো প্রায়ই ওদিক পানে না-পাত্তা হয়ে যেত।

আবার দেখো, কিছুদিন পরে সায়েব মেম দুজনাতে ফের বেশ ভাব হয়ে গেল। আরদালি যে বরখাস্ত হ'ল তা নয়, আর্মস্ট্রঙের হারেম-গমনও বন্ধ হ'ল না। ক্লাবে যেন তখন কোন্ এক সুরসিক বলেছিল, সিভিল সার্জন পরিবার দিশী বিদেশী দুই খানাই পছন্দ করেন।

এ হ'ল প্রাণবন্ত নরনারীর স্বাভাবিক সৌভাগ্য—তারা একটা মডুস ডিভেণ্ডি, বেঁচে থাকার পন্থা, খুঁজে নিতে পারে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী সেখানে কেউই পদদলিত কিংবা অপমানিত হয় নি। অপমান, আমার মনে হয়, আত্মার মৃত্যু। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মানুষ হয়ে যায় পশু। নির্মম জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু, কারণ আত্মা মরে গেলেও তার থেকে যায় বুদ্ধিবৃত্তি, যে বুদ্ধিবৃত্তি পশুর নেই। সে তখন হয়ে যায় হাইড্। যত রকম পাশবিক, নারকীয় জঘন্য পাপ তখন সে করতে পারে তার আহির মনীয় বুদ্ধি, ছলচাতুরী দিয়ে।

আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু তার সব কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

ঐ সময়ের অনেক কিছুই আমার মনে পড়ছে। তার একটা তোমাকে বলি।

জানো তো, পাদ্রী জোন্স্ গুডি-গুডি লোক, তোমরা যাকে বলো, 'ভালোমানুষ'। ধার্মিক লোক আকসারই তাই হয়। যদিও তাঁর অজানা ছিল না যে আমি তাঁকে পর্যন্ত বর্জন করেছি,

তবু ভদ্রলোক রাস্তায় একদিন বেমক্কা দেখা হয়ে যাওয়াতে আমার সঙ্গ নিল—আমি তো তাঁকে গুড ইভনিঙ বলে কেটে পড়ার চেষ্টাই করেছিলুম। আমি যে অশান্তিতে আছি সে-কথা তো তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাতে যে পাদ্রীর উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না, সে তত্ত্বও তিনি জানতেন না।

ইতি-উতি করে, ডোণ্ট্ পোক্ ইয়োর্ নোজ্ ইন্ মাই এফেয়ার্স, (আপন চরকায় তেল দাওগে-এর তুলনায় অনেক মোলায়েম) এটা শোনার জন্য বেশ তৈরি হয়েই ভদ্রলোক আমাকে বললে, যার মর্মার্থ, ইতি-উতিটা বাদ দিয়ে বলছি সাদামাটা ভাষায়ই, তোমার কি বেদনা তা আমি জানি না। কিন্তু জানি, তুমি সুশীল ছেলে, তুমি ধর্মভীরু। তাই বলছি, ভগবান যদি তোমাকে অসুখী করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। যখন সে যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে তখন তুমি এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দাও না কেন যে, আমার তোমার চেয়েও অসুখী লোক এ সংসারে আছে।

সার্‌মন্‌টার মধ্যে খানিকটে সত্য আছে নিশ্চয়ই। ঐ যে আমাদের বাঁদরটা, হার্ভে, কী কুচ্ছিৎ তার চেহারা, আর তার বিদ্‌ঘুটে জামাকাপড় আর চলন-বসন। ক্লাবে কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না, তার গা থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোয় তাতে আমরাই নাক চেপে বাপ্ বাপ্ করে পালাই। খাস খানদানী ইংরেজের বাচ্চা, পাদ্রী টিলার যে কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে জাতে উঠতে পারে কিন্তু বেচারীর কী দুরবস্থা! সেখানেও ক্রিস্‌মাসের রাত্তিরে গিয়ে পাত্তা পায় নি—কোনো

মেয়ে তার সঙ্গে নাচে নি। নেচেছিলেন একমাত্র বুড়ী 'পাদ্রী-মেম। তাঁর কথা আলাদা, তিনি অসাধারণ নারী।

আমি সে রাত্রে ক্লাব এড়াবার জন্যে পাদ্রী টিলায় গিয়েছিলুম। মেয়েরা যা খুশী হয়েছিল তার স্মৃতি চিরকাল আমার মনের মধ্যে রইল। সেই আনন্দ সর্বাঙ্গে আতরের মত মেখে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন দেখি হার্ভে তার মুখে ক্লেদ আর গ্লানি মেখে নিয়ে শ্লথ গতিতে বাড়ি ফিরছে।

আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলুম, কিন্তু, জানো সান্ত্বনাও পেয়েছিলুম পাদ্রীর সার্‌মনের কথা ভেবে যে, আমার চেয়েও দুঃখী এ-সংসারে আছে। বাড়িতে, আমার বুকের ভিতর যে জ্বালা জ্বলে জ্বলুক, কিন্তু সমাজ তো আমাকে ঘেন্না করে না।

এই সান্ত্বনা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি, টেবিলের উপর একটা ক্রিসমাস প্যাকেট। খুলে দেখি, হাউসম্যানের কবিতার বই। আমার বন্ধু আর্নল্ড্ পাঠিয়েছে। ও বই আমি সে রাত্তিরে পেতুম না, কারণ সেদিন মধুগঞ্জে ডাক বিলি হয় না। কিন্তু পোস্টমাস্টার লাহিড়ী গভীর রাত্রেও ইংরেজদের ক্রিসমাস ডাক বিতরণ করাতো।

কবিতার বই। যেখানে খুশি পড়া যায়। খুলতেই চোখে পড়ল,

> Little is the luck I've had
> and oh, 'tis comfort small
> To think that many another lad
> Has had no luck at all.

যে সান্ত্বনাটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তর্ধান করলো। আর্নল্ড নয়, পাঠিয়েছিল আহির মন।

২৫শে আগস্ট

সব খবরই ক্রমে ক্রমে ক্লাব-বাড়িতে পৌঁচেছিল সেকথা আমি জানি, কিন্তু কি চেহারা নিয়ে পৌঁচেছিল সে-কথা বলতে পারবো না। একই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে তুই সত্যবাদী লোক যে কি রকম ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে সে সত্য, পুলিশের লোক হিসেবে, আমরা বেশ ভালো করেই জানি এবং সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই যে আসামী নিষ্কৃতি পায় সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়।

আণ্ডাঘর আমাকে বেকসুর খালাসী হয়ত দেয় নি কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলুম যে এ ব্যাপার নিয়ে ক্লাবের মুরুব্বিরা বেশি নাড়াচাড়া করতে তো চানই নি, যতদূর সম্ভব ধামা চাপা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। এস্থলে যে তাঁরা 'ঘুমন্ত কুকুরটাকে শুদ্ধমাত্র জাগাতে চান নি' তাই নয়, 'বার্কিং ডগটাকে' পর্যন্ত স্ট্র্যাঙল্ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকখানি সক্ষমও হয়েছিলেন।

'বক্সওলাদের' নিয়ে আমিও বেখেয়ালে আর পাঁচজনের মত ছোটখাটো ঠাট্টা-রসিকতা করেছি, কিন্তু যখনই তলিয়ে দেখেছি, তখনি মনের ভিতর লজ্জা পেয়েছি। বক্সওলাদের তুলনায় আমি ভদ্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক, আর এ সংসারের রীতি, দৈবতুর্বিপাকে বড়র যখন মাথা নিচু হয় তখন ছোট তাই দেখে

হাসে। 'সার্ভ হিম রাইট', বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, তার মুখে তখন ঐ এক কথা। এই নিয়ে বাঙলায়ও একটা জোরদার প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা, কারণ বাঙলা শেখার সময় তুমিই আমাকে এই প্রবাদের বইখানা দিয়েছিলে। বাঙলাটা আমার আর মনে নাই, তাই ইংরিজীটাই দিচ্ছি। 'হুয়েন্ দি এলিফেন্ট্ সিঙ্কস্ ইন্ টু দি মায়ার, ঈভন্ দি ফ্রগ্ গিভস্ হিম্ এ কিক্!' আমাদের দেশের তুলনায় তোমাদের দেশে বড় ছোটর পার্থক্য অনেক বেশি তাই বোধ করি তোমাদের তুলনাটায় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা ফুটে উঠেছে বেশি।

ক্লাব বাড়ির কোনো কোনো ব্যাঙ নিশ্চয়ই আমাকে লাথি মেরেছে, কিন্তু সেখানকার গণ্ডার, হিপো, অর্থাৎ মাদামপুর বিষ্ণুছড়া তাদের জিভের লকলকানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় কি?

তবেই দেখ, আহুর মজদাও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। আহির মনের ক্রূর সর্পদংশনে আমার অন্তরাত্মা যাতে করে জর্জরিত না হয়ে যায় তাই তিনি আমার ধমনীতে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলেন ক্লাব বাড়ির অযাচিত সহৃদয়তার সঞ্জীবনী সুধারস।

কিন্তু জানো, সোম, শক্ত ব্যামোতে ওষুধ যদি ঠিক মাত্রায় না দেওয়া হয় তবে ফল হয় উল্টো। বিষ তখন সেই ওষুধ থেকে নূতন শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। বীজাণুকে সিদ্ধ করে মারতে গিয়ে তুমি যদি জল যথেষ্ট না ফোটাও তবে জল আরো বেশি বিষিয়ে ওঠে। আমার বেলা হ'ল তাই।

এবং সেই জিনিসটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। আহির মন আমাকে তার দাসানুদাস করে ফেলল।

আমি ক্লাব বাড়ির সদাশয়তা না দেখে, উপলব্ধি করলুম, সংসারে যত বড় অন্যায় অবিচার হোক না কেন, ধর্মের অনাচার অধর্মের যতই প্রসার হোক না কেন, একদল লোক সেটাকে চাপা দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। এবং আশ্চর্য তাঁরা যে অসাধু তাও নয়। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া এঁরা দুজনাই অতিশয় সহৃদয় ভদ্রলোক। এ পাপ ছড়িয়ে পড়লে অর্থাৎ আমাদের কেলেঙ্কারির কথা রাষ্ট্র হলে, ইউরোপীয় সমাজের অকল্যাণ হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা সেটা চেপে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে—যেমন আমার বেলায়—সজ্জনরা সে পাপ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন!

এ-সম্বন্ধে বাকি কথা পরে হবে।

তুমি তখন ছুটি নিয়ে কাশী না গয়ায় কোথায় গিয়েছ।

এদিকে মধুগঞ্জে এল বন্যা।

দিন সাতেক ঝমাঝম্ বিষ্টি। তারপর দিন তিনেক পিটির-পিটির। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই, কারণ আমাদের বছরের বরাদ্দ একশ' বিশ ইঞ্চির তখনো একশ' ইঞ্চি হয় নি। এমন সময় কোনো রকমের পূর্বাভাস না দিয়ে পাহাড় থেকে হুড়হুড় করে নেমে এল সাত হাত উঁচু জলের এক ধাক্কা। সঙ্গে নিয়ে এল বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি আর কুঁড়ে ঘরের

আস্ত চাল। তার উপর আঁকড়ে ধরে আছে মৃত্যু-ভয়ে কম্পমান শত শত নরনারী, পশুপাখী, এমনকি, সাপ-বিছুও। সকলের সম্মুখেই মৃত্যু যখন সশরীর বর্তমান মানুষ তখন সাপকে মারে না, সাপ মানুষকে কামড়ায় না। ক্ষুধার উদ্রেকও নিশ্চয় তখন হয় না—একই বাঁশের উপর আমি তখন সাপের কাছে ইঁদুরকে বসে থাকতে দেখেছি। আর জলের তাড়া খেয়ে সাপ তো আমার ডিঙিতে আশ্রয় নিতে ধেয়ে এসেছে কত গণ্ডা—ওদিকে মাঝিরা লগি দিয়ে জলে ঝপাঝপ মার লাগাচ্ছে তারা যেন না আসে—তবু আসবেই।

মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নরনারী উদ্ধারের জন্য চিৎকার পর্যন্ত করছে না। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই করেছিল। এখন বোধ হয় গলা ভেঙ্গে গিয়েছে। আর বাঁচাবে কে? যে ক'খানা নৌকো ভেসে যাচ্ছে, সেগুলো মানুষের ভারে এই ডোবে কি ঐ ডোবে। যে লোকগুলো নৌকায় আশ্রয় পেয়েছে তারা আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে হয়ে গিয়েছে কঠিন। আর একটি মাত্র শিশুকেও তারা নৌকায় স্থান দিতে নারাজ।

জলের উপর দিবারাত্র ভেসে চলেছে অগুণতি মড়া। গোরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর, মোষ—হাতি পর্যন্ত। ভেবে আমি কূল-কিনারাই পেলুম না, পাহাড়ের উপর কতখানি তোড়ে জলের স্রোত নেমে আসতে একটা হাতী পর্যন্ত বেকাবু হয়ে নদীর জলে ভেসে এসেছে। একটা হাতী কোনগতিকে সাঁতার কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল আমারই টিলার নীচে। দেখেই বুঝলুম, বুনো। তখন সে নির্জীব, কিন্তু পরে না আশপাশে

আতঙ্কের সৃষ্টি করে, সেই আশঙ্কায় ওটাকে গুলি করে মারবো কি না যখন ভাবছি, তখন মধুমাধব জমিদারীর মাহুৎ—উঁচু জায়গার সন্ধানে সে তার হাতী নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমার পিছনের টিলায়—তাকে দিব্য পোষ মানিয়ে নিয়ে গেল আপন হাতীর সঙ্গে বনে ভিতর। যাবার সময় আমাকে সেলাম করে বলল, 'এ-হাতী আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে হুজুর। এ-হাতী আর কখনো বনে ফিরে যাবে না, কারো অনিষ্টও করবে না। হাতী তো নেমকহারাম জানোয়ার নয়।'

শুধু জল আর জল। বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই কাজলধারার কালো জল ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে হয়ে গেল সাদা। কিন্তু ধবল-কুষ্ঠের মত কি রকম যেন এক বীভৎস সাদা নিয়ে। কোনো কোনো সাপের গায়ে আমি এ-রঙ দেখে শিউরে উঠেছি এবং বিষাক্ত কি না সে খবর না নিয়েই মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। এ-জলের মাথায় যদি লাঠি মেরে কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারতো!

প্রথম ধাক্কাতেই বান ভেঙে দিল আমাদের নদীর পাড়। ডুবিয়ে দিল শহরের নীচু জায়গায় বাড়িঘর। ভাগ্যিস প্রথম জোর মারটা এসেছিল দিনের বেলায়, না হলে কত লোক এবং আমাদেরই চেনা লোক যে এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে চলে যেত তার সন্ধান পর্যন্ত আমরা পেতুম না। তারা আশ্রয় নিল জাত-বেজাতের নৌকোয়, বাকীরা এসে উঠলো টিলা-টালার উপরে। আমাদের মধুগঞ্জে আছে কটাই বা তাঁবু! তারই সব ক'টা পড়ল এখানে-ওখানে। বাকীরা টিলা থেকে

ডাল-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তুললে চালাঘর। মুদীরাও আশ্রয় নিয়েছে সেইখানেই—আর যাবেই বা কোথায়? তোমার পরিবারের আশ্রয়ের জন্যে আমি আমার ভাওয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। সে নৌকা এনে বাঁধা হ'ল আমার টিলার নীচের বটগাছের সঙ্গে।

আশ্চর্য, শহরে কোনো কুকীর্তি হলে আমরা যে ক'টা ভ্যাগাবণ্ড বকাটে ছোঁড়াকে সন্দেহ করে ধরে এনে তাদের ধরে চোটপাট লাগাতুম, তারাই দেখি সকলের পয়লা কোমর বেঁধে লেগে গেল উদ্ধারের কাজে। এক মুহূর্তেই কোথায় গেল তাদের তাস-পাশা, ইয়ার্কি-খিস্তি। আর সবচেয়ে ত্যাঁদোড় ঐ পরেশটা—যে আমার বাগানের লিচু পর্যন্ত চুরি করেছে, রায়বাহাদুর কাশীশ্বরকে পর্যন্ত যে আড়াল থেকে মুখ ভ্যাঙচায় —সে দেখি তার ইয়ারদের নিয়ে কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর উপরে। সেই বানের ভরা গাঙ্গে! কত লোক বাঁচালো তারা! দিনের শেষে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখি আর সবাই চলে গিয়েছে, সে একা ভেলার উপরে বসে নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। গায়ে ধুতির ভিজে খুঁট। আমার বরসাতিটা আমি তার দিকে ছুঁড়ে দিতে সে সেটা লুফে নিয়ে আমার দিকে ফের ছুঁড়ে ফেরৎ দিলে। বত্রিশখানা দাঁত বের করে এ কান ও-কান জুড়ে হা করলে—এই হ'ল আমাদের 'থ্যাঙ্কস্, নো'র বাঙলা অনুবাদ।

তুমি জানো, সোম, বন্যার পর শহরে কোনো কুকর্মের জন্য ওদের সন্দেহ করলে, ডেকে শুধু 'বাপু, বাছা,' করতুম, হু-

একবার জেনে শুনে ছেড়ে দিয়েছি। কড়া কথা বলতে প্রবৃত্তি হয়নি।

আহুর মজদা আর আহির মনে নিরন্তর এ কী দ্বন্দ্ব! আহির মনের যে চেলার জ্বালায় উদয়াস্ত সমস্ত পাড়া অতিষ্ঠ, সঙ্কটের সময় সে দেখি হঠাৎ আহুর মজদার ডাকে 'হা-জি-র' বলে তৈরী, প্রাণটা খোলামকুচির মত বন্যার জলে ডুবিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত!

তোমার বিশ্বাস, কোনো কোনো মানুষ পাপাত্মা— ক্রিমিনাল মাইণ্ড নিয়ে জন্মায়। শেষবারের মত বলছি, তা নয় সোম, এরা সব মিস্‌ফিট্‌। এরা শুধু সঙ্কটের মাঝখানে জীবসত্তার চৈতন্যবোধে বেঁচে থাকার আনন্দ (জোয়া দ্য ভিভ্‌র্‌) পায় বলে দৈনন্দিন জীবন এদের কাছে অসহ্য একঘেয়ে বলে মনে হয়। আমার দেশে এরকম ছোঁড়ারা পল্টনে ঢুকে গিয়ে আপন জীবনের সার্থকতা পায়। তাই বাঙালী পল্টন খোলা মাত্রই আমি সর্বপ্রথম এদেরই ডেকে পাঠিয়েছিলুম। এরা যে সেখানে সুনাম করেছে, সেকথা তোমার অজানা নয়।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম।

সেই সর্বব্যাপী হাহাকারের ভিতর আমি কিন্তু একটি বড় মধুর দৃশ্য দেখেছি। আমার টিলা, পাদ্রী টিলার চতুর্দিকে যখন আশ্রয়ার্থীরা চালা, মাচাঙ বানাতে ব্যস্ত, ভিজে কঞ্চি-বাঁশ দিয়ে আগুন জ্বালাতে গিয়ে মেয়েরা চোখের-জলে নাকের-জলে, তখন দেখি বাচ্চারা মহোল্লাসে শেক্সপীয়রের 'প্রিম্‌রোজ্‌ পাথ্‌ টু ইটার্নেল বন-ফায়ারের' পিক্‌নিক্‌ চড়ুই-ভাত বনের ভিতর

সফল করে তুলেছে। এদের একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয়, ইস্কুল ঘরে, কিংবা খেলার মাঠে, তা-ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আজ যেন তারা সবাই এক বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড পরিবার। সে-বাড়ির ছাদ আকাশ, দেয়াল টিলাগুলো, খেলনার জন্য দুনিয়ার গাছপালা, ঢিপ-ঢিপা আর নাশ্‌তার জন্য পিষ্টি-বৈচি-মন, আনারালি, কালোজাম, বুনো কাঁঠাল। আর সবচেয়ে বড় আনন্দ, বাপ-মা শাসন করে না, তারা আশ্রয় নির্মাণে মত্ত। এরা যত বাইরে বাইরে কাটায়, ততই মঙ্গল। এই হনুমানদের জ্বালায় টিলার হনুমানগুলো তখন বাপ্‌-বাপ্‌ করে এ-তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছিল।

শেষটায় জল এসে ঢুকল আমার লিচু বাগানে।

আগে ছিল আমার বাড়ির সামনের গাছপালার সবুজ, তারপর কাজলধারার কালো জল, তারপর ফের ধান ক্ষেতের কাঁচা সবুজ এবং সর্বশেষে কালাই পাহাড়ের নীল রঙ। এখন আমার আর পাহাড়ের মাঝখানে শুধু নোংরা ঘোলা জলের একরঙা উদরী রোগীর ফুলে-ওঠা পেটের মত এক ভয়াবহ সত্তা। তারই মাঝে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ঘর, আর কোনো ঘর মাথা অবধি ডুবিয়ে—জলের উপর শুধু টিনের চারখানা চাল বসে আছে, মোষ যেরকম সর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়ে দিয়ে শুধু মাথাটা উপরে ভাসিয়ে রাখে। সবকিছু জলে একাকার বলে আসল নদীটি কোথায়, সে শুধু বোঝা যাচ্ছে, তার উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া কালো কালো ঢিপি থেকে—মড়া মোষ, শূয়োর, গোরু আরো কত কী! আর আমার

বারান্দায় লক্ষ লক্ষ কেঁচো—সাপ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে কি তখন এসব দেখেও দেখি নি। আজ দেখছি, আমার অজানাতে মন অনেক কিছু স্মরণ রেখেছে। আমি তখন পাঁচশটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যেসব কাজ সম্বন্ধে আমার কণামাত্র অভিজ্ঞতা নেই।

তোমাদের জাতটা এমনিতে বড় ইনডিসিপ্লিন্‌ড্‌ কিন্তু বিপদের সময় আমাদের তুলনায় তোমরা অনেক বেশি কমন্‌সেনস্‌ ধরো। আপনা থেকে কেমন যেন একটা ডিসিপ্লিন্‌ তোমাদের ভিতর এসে যায়। তা না হলে আমার সেই পাগলের মত ছুটোছুটির ফলে ইষ্ট না হয়ে কি যে অনিষ্ট হত বলতে পারিনে।

সাত দিন ধরে আমি কলের মত কাজ করে গিয়েছি—আমি সম্বিতে ছিলুম না। এমনকি, আমার জীবনের আপন ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম।

অষ্টম দিনে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সম্বিতে ফিরলুম। ডাণ্ডশ মেরে মানুষ একে অন্যকে অজ্ঞান করে। আমাকে ডাণ্ডশ মেরে আনা হ'ল সম্বিতে।

বাঙলোয় এসে শুনলুম, মেব্‌লের বাচ্চা হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

তোমাদের সকলের মুখে শুনি, কর্ম করে যাবে, ফললাভের আশা ত্যাগ করে। ফল দেওয়া-না-দেওয়া ভগবানের হাতে। এই নাকি তোমাদের সর্ব অভিজ্ঞতা, সর্বশাস্ত্রের মূল কথা।

মা মেরি সাক্ষী, আমি বন্যার সাত দিন কোনো ফললাভের আশা করে কাজ করি নি। আমি আমার আপন প্রাণ বিপন্ন করে যাদের বাঁচিয়েছিলুম, তাদের কেউ কেউ বন্যার পর কলেরায় মারা যায়। তাই নিয়ে আমি শোক করি নি। অন্য ফলের কোনো প্রশ্নই তো আমার মনে ওঠে নি।

কিন্তু কর্মফলের লোভ ত্যাগ করে যে মানুষ কাজ করে গেলো, তাকে অর্থাৎ তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রকে বুঝি তোমাদের ভগবান বখশিশ্ দেন জারজ সন্তান!

১লা ডিসেম্বর

যতই ভাবি মনকে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হতে দেব না, মূল কথা সংক্ষেপে বলে ফেলব, ততই দেখি আশ-কথা, পাশ-কথা সব কথাই মনের ভিড় থেকে বাইরের প্রকাশে এসে নিষ্কৃতি পেতে চায়। অথচ মনের গভীর গুহাতে যে সব ভূত্যের নৃত্য অহরহ চলেছে তাদের একটাকেও তো আমি ভালো করে ধরতে পারছিনে। অজ্ঞানে, সজ্ঞানে, সুষুপ্তিতে, স্বপ্নে এরাই গড়ে তুলছে আমার জীবন-দর্শন—ভেল্ট-আন্‌শাউউঙ্—তারই বুদ্বুদ্ শুধু চেতন মনে ভিড় করে, আত্মপ্রকাশের জন্য।

সে মনের গুহায় আছে কত প্রাণী,—হেমলেট, ডন কিক্‌সট্, ডক্টর জীক্‌ল, মিস্টার হাইড এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে এদের নাচাচ্ছেন আহুর মজদা, আহির মন, হয়তো ছেলেবেলাকার আমার আরাধ্যা দেবী মা মেরি তখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ফেলেন নি—এখনো আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার শহরের গির্জায় আমি হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছি

আর তিনি করুণ বয়ানে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ; এ স্বপ্ন আমি বড় ডরাই।

কখনো দিনের পর দিন বারাণ্ডায় জড়ের মত বসে রইতুম হেমলেট হয়ে, আর তাকে ডক্টর জীক্‌ল কানে কানে বলতো, 'এই ভালো, চুপ করে বসে থাকো। সংসারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কি করতে পারো তুমি? কোন্ কর্মের কি ফল, তা আগে ভাগে জানবে কি করে!' ভুলে গেছ, অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের সেই গল্পটা, প্রভু যীশু এক অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ; তার পর পথে যেতে যেতে একদিন দেখেন, সেই লোকটা এক বারবনিতার দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে আছে। প্রভু বিরক্ত হয়ে তাকে শাসন করলেন। উত্তরে সে কাতরকণ্ঠে বললে, 'আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, আপনি আমাকে দয়া করে সে শক্তি দিলেন। এখন আমি তা দিয়ে অন্য কি করতুম, বলুন।' তাই দেখো, কোন্ কর্মের কি ফল তা স্বয়ং প্রভু যীশুই যখন জানেন না, তখন তুমি, কীটস্য কীট, তুমি জানবে কি করে? কিম্বা স্মরণ করো সেই চীনে গল্পটা। এক জমিদারের ছেলে বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে গুম্ হয়ে গেল। পাড়া-প্রতিবেশী তার বাড়িতে এসে শোক প্রকাশ করে তাকে সান্ত্বনা জানালে। জমিদার ছিলেন জ্ঞানী লোক, শুধু বললেন, 'এ যে খারাপ হ'ল, জানলে কি করে?' তার দিন দশেক পরে ছেলেটা বন থেকে ফিরে এল একটা চমৎকার বুনো ঘোড়া সঙ্গে করে। সবাই এসে সানন্দে অভিনন্দন জানালে। জমিদার বললেন, 'এ যে ভালো হ'ল, জানলে কি করে?' তার কিছুদিন পর

ছেলেটা ঐ বুনো ঘোড়া থেকে পড়ে পা'খানা ভেঙে ফেললে। সবাই এসে শোক প্রকাশ করলে। জমিদার বললেন, 'এ যে খারাপ হ'ল, জানলে কি করে?' তার কিছুদিন পর লাগল লড়াই, সম্রাটের লোক এসে ধরে নিয়ে গেল সব জোয়ানদের; ছেলেটার পা ভাঙা বলে তাকে যেতে হ'ল না। সবাই এসে আনন্দ জানালে। জমিদার বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবেই দেখ, কিসে কি হয়, বলবে কে?

আর কখনো বা সেই মারমুখো ডন কিক্সট্কে আরো ওস্কাতে লাগত তার পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার হাইড। 'কি দেখছো, বসে বসে? তোমার লজ্জা-শরম নেই, অপমান বোধ নেই? তুমি কি একটা পা-পোশ না আস্ত একটা ভেড়ুয়া? আণ্ডা-ঘর তোমাকে নিয়ে কি ঠাণ্ডা-ব্যঙ্গ করে তার খবর রাখো? ইস্তেক নেটিভ, কালা-আদমী খানসামাগুলো?' 'এদিকে চোরচোট্টার উপর কি রোয়াব ওঃ, যেন কলকাত্তার হাই-কোর্টের বড় জজ সায়েব নেমে এসেছেন মধুগঞ্জের গুনাহ্-হারামী খতম করবার জন্য আর ওদিকে নিজের ঘরের বউ যে চুরি হয়ে গেল তার জন্য কোনো গরমি নেই। সায়েবের গায়ে বুঝি মাছের রক্ত—তাও শিঙি মাছের না, একদম্ পুঁটি।' 'বুঝলে হে, মহামান্য-বরেষু, সিন্নোর ডন্ কিখোটে, ব্যারারা এই কথা কয় কত রঙে কত ঢঙে! আর তোমার বাটলারটা! তওবা, তওবা—তা তোমাকে বলে আর কি হবে? এইবার লেগে যাও, তোমার—হোঃ, হোঃ, হোঃ, তো-মা-র ছেলের ব্যাপ্‌টিজমের ব্যবস্থা করাতে।'

এই রকমই একদিন ডন কিক্‌সট্‌, বা আমি, হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে করলুম বাচ্চার বাপ্তিস্মের প্রস্তাব, জয়সূর্যকে গড্‌-ফাদার বানিয়ে। তোমার মনে থাকার কথা, কারণ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে তুমি।

কা'কে অপমান করার জন্য এ প্রস্তাব আমি করেছিলুম? মেব্‌ল্‌কে? নিজকে? কি বলব? ডন কিক্‌সট্‌ কি কোনো কিছু ভেবে চিন্তে করে? তবু লেখক সেরভান্তেসের মানসপুত্র ডন কিক্‌সট্‌ কখনো কারো কিছু অনিষ্ট করে নি। আমি ডন্‌ কিক্‌সটের পিছনে ছিল যে মিস্টার হাইড।

গির্জে ঘরের সে দৃশ্য তোমার মনে আছে? মাঝে মাঝে আমার পর্যন্ত মনে হয়েছিল, কাজটা বোধ হয় ঠিক হ'ল না।

তখন মিস্টার হাইড ধমক দিয়ে বলেছে, 'ফের!'

আর আহির মন বলেছে, 'জীতে রহো বেটা!'

আমি যা-কিছু করেছি তার জন্য তোমার কাছ থেকে আমি কোনো করুণা ভিক্ষা করছিনে, কোনো সহানুভূতিও চাইছি না, কিন্তু সোম, আমার ভিতর এই যে গোটা ছয় ভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি অষ্টপ্রহর অনবরত লড়াই চালাতো, আমাকে নির্মমভাবে এদিক ওদিক টানা-হ্যাঁচড়া করত—একটা মড়াকে যে রকম দশটা শকুন ছেঁড়াছেঁড়ি করে—আমার জাগরণ বিষাক্ত করে রাখত, আমি ঘুমুতে গেলেই খাটটা নাড়াতে থাকত, ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্নের মত বুক চেপে বসতো, জেগে উঠেই দেখতুম তারা সব লোলুপ নয়নে পহর গুনছে, কখন আমি জাগব, কেউ দেবে চোখে ঠোকরে, কেউ ফুটো করে দেবে তালুটা—এরা আমাকে

নিয়ে কি করেছিল সেইটে তুমি কিছুটা বুঝতে পারলেই. আমি আমার জীবনের এদিকটার কথা আর তুলবো না।

আপিসে কাগজপত্র সই করার সময় তারিখ দিতে হয়, খবরের কাগজও মাঝে মাঝে পড়েছি, কাজেই দিন, মাস, বৎসর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন কখনো হতে পারি নি। তাই জানি এই করে করে বছর পাঁচেক কেটে গেল।

সত্যি বলছি, সোম, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার জীবনে এ পাঁচ বছরে কিছুই ঘটে নি। লড়াই লেগেছিল বলে প্রচুর খেটেছি, হাট লুট বন্ধ করে রেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনকে ছড়াতে দিইনি। সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, তার জীবন বিকাশ লাভ করে এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, বাইরের ঘটনা তার মনকে গড়ে তোলে ; আবার সেই মন তার ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমার জীবনের উপর বাইরের কোনো ঘটনা এ পাঁচ বছর কোনো দাগ কাটতে পারে নি।

আর ভিতরের জীবনের কিছুটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়েছি। তার ভিতরকার জট যদি আমি নিজেই ভালো করে ছাড়াতে পারতুম তা হলে তোমাকে বলতুম—আমি পারি নি।

শুধু মেব্‌ল্ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।

যে মেব্‌ল্ একদিন মার্সেলেসে দাঁড়িয়ে মভ রঙের রুমাল নেড়ে নেড়ে জাহাজে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, পাড়ে নেমে আমি রেখেছিলুম তার কাঁধে আমার হাত দু'খানি, সে চেপে ধরেছিল আমার বাহু দু'খানি—সেই মেব্‌ল্ই হঠাৎ যেন আমাকে

পাড়ে ফেলে উঠে পড়ল জাহাজে আর ধীরে ধীরে সে জাহাজ অদৃশ্য হ'ল অসীম নীলিমার অন্তহীন শূন্যতায়। কাতর আর্তনাদে, করুণ নিবেদনে আমি তাকে ডাকতে পর্যন্ত পারলুম না।

আর সেই মেব্‌ল্‌-ই এই বারাণ্ডাতেই বসে, আমার থেকে তিন হাত দূরে।

শুধু বুঝলুম, আমার জীবন থেকে এ দ্বন্দ্ব কখনো যাবে না। শান্তি আমি কখনো পাবো না।

৫ই ডিসেম্বর

পেট্রিকের জ্বর হয়েছে। সিভিল সার্জন দেখে গিয়েছে। বলেছে ভয় নেই। মেব্‌ল্‌ পাংশু মুখে বারাণ্ডায় পাইচারি করছে। একবার হ্যাটটা মাথায় দিয়ে পাদ্রীটিলার দিকে রওয়ানা হ'ল। বহুকাল হ'ল সে বাড়ি থেকে আদপেই বেরোয় নি। কিন্তু গেল না। ফিরে এল। তারপর বারাণ্ডার রেলিঙে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

আমি তো অন্ধ নই। দেখলুম, মাতৃত্বের রসে মেব্‌লের দেহখানির প্রতি অঙ্গটি কি অপরূপ পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য পেয়েছে। যেন এদেশের বর্ষার ভরা পুকুর।

অনেকক্ষণ পরে মেব্‌ল্‌ আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে, 'এদেশের আবহাওয়া পেট্রিকের সইছে না। তার পড়াশুনোর ব্যবস্থাও এখানে ঠিকমত হবে না। আমরা বিলেত

যাই। তুমিও সঙ্গে চলো না? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

বহুকাল পরে মেব্‌ল্‌ কথা বললো।

আমি বললুম, 'সেই ভালো। তবে আমি সঙ্গে আসতে পারবো না। তোমরা ইংলণ্ডের কোথাও বাড়ি করে থাকো। আমি পরে সুযোগ পেলে যাবো।'

মেব্‌ল্‌ মাথা নেড়ে সায় দিলে। সে কখনো আমার কোনো ইচ্ছায় আপন অনিচ্ছা জানায় নি, নিজের ইচ্ছা তো প্রকাশ করতই না!

এরকম ধারা কোনো একটা পরিবর্তন আমার জীবন-প্যাটার্নে আসতে পারে সেকথা আমি কখনো ভেবে দেখি নি।

অথচ এ তো কিছু খুদার-খামাখা আজগুবী সমাধান নয়। চার-পাঁচ বছরের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে আমার মত দু-পয়সাওয়ালা লোকের পরিবার আকছারই তো বিলেত যাচ্ছে।

তবু আমি সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে রইলুম অসাড়ের মত।

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে।

দেখি সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি। সব সমস্যার সমাধানই হয় ঘুমে, স্বপ্নে কিম্বা অবচেতন মনে।

মাত্র যে তিনটি প্রাণীর সঙ্গে আমার জীবনের যোগসূত্র, বরঞ্চ বলি, যে তিনটি প্রাণী আর আমাকে নিয়ে আমার জীবন, তারাই আমার জীবনকে অসহ্য করে তুলেছে পলে পলে, প্রতি ক্ষণে তারা আমার আয়ু ক্ষীণ করে নিয়ে আসছে, তিন দিক

থেকে তিন রাহু আমার জীবনকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে একদিন বিলুপ্ত করে দেবে। এই নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের আরম্ভ। পরের সিদ্ধান্তগুলো এক এক করে এই ;

দূরে চলে গিয়ে আমার উপর এদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে।

এ সংসারে এরা বেঁচে থাকবে, না আমি বেঁচে রইব ?

আমি।

এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই। মেব্‌ল্‌ পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপ-জাত সন্তান। আমি নির্দোষ, আমি কোনো পাপ করি নি। আমি কস্মিন কালেও কারো হক্কের ধন থেকে একটি কাণাকড়িও কেড়ে নিইনি। এরাই দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন আমাকে দেবে শুধু ফাঁকি।

এরা মরে গেলে আমি শান্তি পাবো। আমার দ্বন্দ্বের সমাধান হবে।

খুন কি করে করা হয়, তার সবকটা পদ্ধতিই জানি আমরা। তুমি আমি অর্থাৎ পুলিশ। খুনীরা আপন আপন সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি অনুযায়ী পন্থা বেছে নিয়ে করে খুন। সব খুনের ইতিহাস, বিশ্লেষণ জড়ো হয় থানায়। কোন্‌ পন্থার কি গলদ, সামান্য কি একটা ত্রুটি কিম্বা বিচ্যুতি এড়ালে খুনী ধরা পড়তো না, এসব তত্ত্ব আমাদের ভালো করে জানা। আমরা যদি নিঁখুত খুন না করতে পারি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন কোনো ঢ্যাঙা লোকও সে চাঁদ ধরবার আশা না করে।

এ তো চ্যালেঞ্জ নয়। এ তো অতি সোজা কাজ।. কিন্তু অতি সরল কর্মও অবহেলার সঙ্গে করতে নেই।

আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমার মনের গুহার হ্যামলেট, কিক্‌সট্‌, জীকৃল, হাইড, মজদা, মন্নু সবাই মরে গিয়েছে। এখন যা-সব আমি করতে যাচ্ছি, সে-সব ডেভিড ওরেলির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে যে রকম বন্যার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম, পেট্রিকের বাপ্তিস্ম পরব করার সময় আমি যে রকম স্থির নিশ্চয় হয়ে এগিয়েছিলুম, এবারে ঠিক তাই।

সকাল বেলা জয়সূর্যকে ডেকে বললুম, 'তুমি মেব্‌লূদের জাহাজ ধরিয়ে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ কিম্বা অন্য কোনো বন্দরে। সেটা পরে স্থির হবে। তারপর তুমি কিছুদিনের জন্য সেখান থেকে সোজা দেশে যেয়ো। আগে যখন ছুটি চেয়েছিলে, তখন সুবিধে হয় নি, এখন আমার একলার কাজ আরদালিই করতে পারবে।'

জয়সূর্য খুশী না বেজার হ'ল তার মুখ থেকে বোঝা গেল না।

আমি সেদিনই কুকটুক সব ট্র্যাভেল এজেন্সীকে চিঠি লিখে দিলুম, কবে কোন্ বন্দর থেকে কোন্ জাহাজ ছাড়বে, জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, ভাড়া কত ইত্যাদি জানাতে। ফলে যে সাত ডাঁই মালমশলা উপস্থিত হ'ল, সে তো ঐ সময় তুমি এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেছ। আমার কেমন যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে, সেদিন তোমার সঙ্গে একটু খিটখিটে ব্যবহার করেছিলুম। তার কারণ যদিও তখন আমি

ঐসব কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম, কিন্তু আসলে তারই আড়ালে আমার অন্য প্ল্যানটাকে আমি ফিটফাট ওয়াটার-টাইট করে নিচ্ছিলুম।

বাইরের শো'টাকে তার ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য আমার দরকার ছিল শুদ্ধ কয়েকখানা লাগেজ লেবেলের। কোনো কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সী খদ্দেরকে আপন চালাকি দেখাবার জন্য কেবিন বুক হওয়ার পূর্বেই কিছু লাগেজ টিকেট পাঠিয়ে দেয়। যেমন যেমন মেব্‌লের এক একটা সুটকেস, ওশ্‌ন্‌ ট্রাঙ্ক তৈরী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের উপর সেই লেবেলগুলো সেঁটে দিতে লাগলুম।

ওদের দিকটা তৈরী, এখন আমার দিকটা ঠিক করতে হবে।

মানুষ মারা তো অতি সহজ, বিশেষ করে সে মানুষ যখন তোমার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। আসল সমস্যা মড়া নিয়ে। বেশীর ভাগ খুন ধরা পড়ে মড়া থেকে এবং খুনী ধরা পড়ে তার থেকে।

ক্রমে ক্রমে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাক্স প্যাঁটরা তৈরী, রাস্তার জন্য অল্পস্বল্প খাবার দাবারও প্যাক করা হয়েছে। পরদিন ভোর বেলা আমি মেব্‌ল্‌দের মোটরে প্রায় কুড়ি মাইল দূরের রেল স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সন্ধ্যের সময় চাকরবাকরদের ছুটি দিলুম। তারা যেন ভোর বেলা এসে মালপত্র মোটরে তুলে দেওয়াতে সাহায্য করে।

ডিনারের খবর নিয়ে যখন জয়সূর্য এল, তখন আমি হঠাৎ

মেব্‌ল্‌কে বললুম, 'আজ এ ডিনারে জয়সূর্য আমাদের সঙ্গে বসে খানা খাক।'

মেব্‌ল্‌ অবাক হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। তার চোখে আপত্তির চিহ্ন ছিল।

আমি বললুম, 'আফটার্‌ অল্‌, ও তো আমাদেরই একজন। অন্তত এক দিনের জন্য তাকে তার ন্যায্য সম্মান দেখানো উচিত।'

মেব্‌ল্‌ চুপ করে রইল।

খানা টেবিলে জয়সূর্যকে বসতে দেখে পেট্রিক খুশী।

আমি বললুম, 'বাটলার, তুমি সুপটা নিয়ে এসো ; মেব্‌ল্‌, তুমি নিয়ে আসবে মাংস ; আর আমি নিয়ে আসবো পুডিং।'

ব্যবস্থাটা সকলের মনঃপুত হ'ল কিনা তা ভাববার ফুরসৎ নেই। আমাকে আমার প্ল্যান-মাফিক কাজ করে যেতে হবে।

সে এক অদ্ভুত ডিনার। সবাই চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে।

পুডিং আনার জন্য আমি গেলুম রান্নাঘরে।

পকেটে আর্সেনিক ছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রে যে পরিমাণের প্রয়োজনের কথা বলে তার চেয়ে একটু বেশি করেই জয়সূর্য, মেব্‌ল্‌ আর পেট্রিকের পুডিঙে মিশিয়ে দিলুম।

ওদের ছটফটানি, মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি দেখি নি। আমি ততক্ষণে বড় লিচু গাছটার কাছে গোর খুঁড়তে লেগে গিয়েছি। কাজ সহজ করার জন্য দুদিন আগে মালিকে দিয়ে সেখানে মৌসুমী ফুল ফোটাবার ফ্লাওয়ার বেড খুঁড়িয়ে রেখেছিলুম। এক বস্তা চূণও আনিয়ে রেখেছিলুম।

রাত প্রায় চারটের সময় গোর শেষ হ'ল।

তারপর লাগেজগুলো নিজে মোটরে তুললুম চাকরদের আসবার আগেই বেরিয়ে যাবো বলে, তাদের বলেছিলুম ছ'টায় আসতে। স্টেশনের পথে দশ মাইল দূরে বঁড়শীছড়া নদীর উপর যেখানে পোল, তারই ডান দিক দিয়ে যে ছোট্ট রাস্তা তারই উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে লাগেজগুলোর সঙ্গে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দিলুম নদীর গভীরে।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আমাদের মহাকবি বলেছেন, ঘুম সঞ্জীবনী রসে প্রাণকে নবজীবন দান করে। সেকথা আমি মানি। কিন্তু তার উল্টোটাও হয়, তুমি লক্ষ্য করছো কি? নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলে, ভাবলে অন্তত ঘণ্টা দশেক গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবে। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই হঠাৎ পা দুটো হ্যাঁচকা টানে সটান খাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল!

শুনি আহির মনের অট্টহাসি। যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এতদিন প্ল্যানের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঠিক ঠিক নিখুঁত-পরিপূর্ণ করে সমস্ত কর্ম সমাধান করলুম, ঘুম ভাঙতেই দেখি পায়ের তলার সে দৃঢ় ভূমি হঠাৎ ভলভলে কাদা হয়ে গিয়েছে আর আমি ক্রমাগত তলার দিকে ডুবে যাচ্ছি। ঘামে আমার সর্ব শরীর ভিজে গিয়েছে, আমি কলাপাতার মত থরথর করে কাঁপছি। আমার শরীর, আমার মন আমার কব্জার বাইরে চলে গিয়েছে। হঠাৎ হয়ত বা চিৎকার করে ফেলি, 'আমি

খুন করেছি। লিচু গাছটার তলা খেঁাড়ো, সবকটা মড়া সেখানে পাবে !'

নিজের গলা সবলে নিজের হাতে চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করি। দেখি, হাত ওঠে না।

এই হ'ল আহির মনের সবচেয়ে বড় শয়তানী। তোমাকে আত্মপ্রত্যয় দেবে, সাহস দেবে, সব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার হাজারো সন্ধিসুড়ুৎ বাৎলে দেবে, তারপর যে মুহূর্তে তার ইচ্ছামত কর্মটি সমাধান হয়ে গেল, অমনি তোমাকে তোমার বিভীষিকার হাতে সমর্পণ করে চলে যাবে।

আমি মর্মে মর্মে অনুভব করলুম, বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বদেশ সর্বশাস্ত্র কেন সবচেয়ে বড় পাপ বলে নিন্দে করেছে।

তাই তখনো আমার যেটুকু শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে আমি আমার শেষ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রইলুম। সেটা কি ?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনো আছে, মেব্‌ল্‌দের খেঁাজ কেউ করবে না। আমার কিম্বা মেব্‌লের ত্রিসংসারে কেউ নেই যে, আমরা কোথায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে। বিলেতে যে দু' একজনের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয়, তারা ভাববে, আমরা এদেশে ; এদেশের লোক ভাববে মেব্‌ল্‌রা বিলেতে। যদি বা কারো মনে কোনো সন্দেহ হয়, তবে সে বিষ্ণুছড়া মাদাম-পুরের মুরুব্বিদের মত ভাববে, কাজ কি এ পাপ ঘেঁটিয়ে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে হয়ত বেরিয়ে পড়বে, মেব্‌ল্‌ ঐ নেটিভ বাটলারটার মিস্ট্রেস হয়ে গোপনে দিন কাটাচ্ছে। হয়ত বিলেতে কিম্বা মসুরিতে। মসুরির কথা ওঠাতে মনে পড়ল,

একবার আণ্ডা ঘরে গুজোব রটে, মেব্‌ল্‌রা মসুরিতে। তার কারণ, মেব্‌ল্‌দের 'বিলেত যাওয়ার পর' আমি একবার মসুরিতে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠি; সেখানে একটি মেম ও তার বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হয়। ওদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতুম বলে কেউ হয়তো আমাদের দেখে মেম এবং বাচ্চাকে ভালো করে সনাক্ত না করতে পেরে খবরটা রটিয়েছিল।

তা সে বিলেতই হোক আর মসুরিতেই হোক সে কেলেঙ্কারীর হাঁড়ি কালা-আদমীদের হাটের মাঝখানে ভেঙে ইয়োরোপীয় সমাজের ক্ষতি বই লাভের সম্ভাবনা কি?

এটা আমি জানলুম সেইদিন, যেদিন আমাদের পারিবারিক কেলেঙ্কারী নিয়ে ক্লাব আলোচনা করে স্থির করলো, এ নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, 'লেট্‌ দি স্লিপিং ডগ্‌ লাই।'

তাই তোমাকে এই চিঠিতেই জোর দিয়ে লিখেছি, পাপ করলেই পুণ্যাত্মা তোমাকে ধরিয়ে দেবে না। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক স্বার্থ হয়তো আছে, সে পাপ গোপন করার।

কাজেই আমাকে কেউ ধরিয়ে দেবে না।

১লা জুন

প্রিয় সোম,

প্রায় ছ' মাস হ'ল তোমাকে আমার চিঠি লেখা শেষ হয়। এরপর যে আবার কিছু লিখতে হবে সে কথা আমি ভাবি নি।

আজ কিন্তু নূতন করে লিখতে হচ্ছে। তার কারণ আমার হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

ত্রিসংসারে আমার বন্ধু নেই। যারা আছে তারা আমার, না-শত্রু-না-মিত্র। এরা যাতে আমার খুন না ধরতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করেছিলুম। এবং ধরার কাছাকাছি এলেও কেন যে আমাকে ধরিয়ে দেবে না তার কারণও আমি তোমাকে বলেছি।

কিন্তু অযাচিতভাবে এ সংসারে হঠাৎ যে আমার এক 'মিত্র' দেখা দেবেন এবং আমার 'মঙ্গল' এবং 'উপকার' করতে গিয়ে আমার খুন ধরে ফেলবেন এ-কথা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তাই হয়েছে।

আমি যুদ্ধের জন্য অনেক কিছু করেছিলুম বলে আই জি মুগ্ধ হয়ে আমার সম্বন্ধে যে-সব 'গুজোব' রটেছে সেগুলো খণ্ডন করতে চান। করতে গিয়ে তিনি এবং ডীন সত্যের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছেন, এ-খবর আমি পেয়েছি।

এর জন্য আমি কোনো ব্যবস্থা করে রাখি নি, এখন আর করবারও উপায় নেই।

তাই যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়ত ঝুলতে হবে।

আমার জন্য শেষকৃত্য হয়ত তোমাকেই করতে হবে।

তাই আমার গোরের উপর নিচের দু'টোর যে-কোন একটা খোদাই করে দিতে পারো।

(For a Godly Man's Tomb)

Here lies a piece of Christ ; a star in dust
A vein of gold ; a china dish that must
Be used in Heaven, when God shall feast the just.

কিংবা

(For a Wicked Man's Tomb)

Here lies the carcasse of a cursed sinner,
Doomed to be roasted for the Devil's dinner.

ডেভিড ও রেলি।

॥ সমাপ্ত ॥